করোনাকালে কর্মহীন কর্মীদের করুণ কাহিনী

তোমরা অমর

ছফিয়া (ছফি) গমেজ
জন্ম : ১৭ মার্চ, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৪ এপ্রিল, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ
উলুখোলা, মঠবাড়ী ধর্মপল্লী

তোমরা যে সত্যিই পৃথিবীর মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে চলে গেছো স্বর্গের অনন্ত যাত্রায় এ চিরন্তন সত্যটি আমাদের মেনে নিতে খুবই কষ্ট হয়। তোমরা ছিলে আমাদের ঈশ্বরের পথ দেখানো আদর্শ বাবা-মা। তোমাদের আদর্শেই আমরা আজ চলছি ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায়। আজ কৃতজ্ঞচিত্তে, শ্রদ্ধাভরে ও নতশিরে তোমাদের জানাই হাজারো প্রণাম। তোমাদের প্রার্থনাপূর্ণ, সেবাপরায়ণ পবিত্র জীবনযাপনের কথা এখনো পাড়া-প্রতিবেশীরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

প্রার্থনা করি দয়াময় প্রভু পরমেশ্বরের কাছে, যতদিন আমরা এ ধরণীতে আছি ততদিন যেন, তোমাদের আদর্শ-ভালবাসা ও ক্ষমার বাণী হৃদয়ে ধারণ করে যেতে পারি। ঈশ্বর তোমাদের অনন্ত শান্তি দান করুন।

রেজিন গমেজ
জন্ম : ২৪ ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৯ এপ্রিল, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ
উলুখোলা, মঠবাড়ী ধর্মপল্লী

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,

মেয়ে ও মেয়ে জামাই	:	প্রয়াত মঞ্জু রোজমেরী - জ্যোতি গমেজ
ছোট মেয়ে	:	সিস্টার মেরী আরতি, এসএমআরএ
নাতি-নাতি বৌ	:	মানিক-সারা গমেজ
নাতী-নাতীন জামাই	:	শিবা-সুবাস গমেজ, অসীম-মুক্তা গমেজ, হীরা-বিকাশ রোজারিও
পুতি-পুতিন	:	শুভ্র, জেনিফার, মাধিন্তা, সাইনী, এভারলি ও শুভন

উলুখোলা, মঠবাড়ী ধর্মপল্লী

বাবার চির বিদায়ের তৃতীয় বার্ষিকী

প্রয়াত এডুয়ার্ড সুবল কস্তা
জন্ম : ২৯ অক্টোবর, ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ
মৃত্যু : ৪ মে, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
চড়াখোলা (আইলসা বাড়ি)
তুমিলিয়া ধর্মপল্লী

প্রিয় বাবা,

নিয়তির বর্ষ পরিক্রমায় তোমার চির বিদায়ের তৃতীয় বছরটি অতিক্রান্তের পথে। তোমার এই চির বিদায় আমাদের অন্তরে আরো গভীর অনুভবে নাড়া দিয়ে তোমাকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়। বাবা আমাদের হৃদয়ে তোমাকে বারবার স্মরণতো হবেই বাবা। তুমি যে আমাদের পরম মমতায় আগলে রেখেছিলে। বটবৃক্ষের ছায়া হয়ে থাকতে। আজ তোমার ভালবাসার স্ত্রী, আমাদের মা আগলে রেখেছেন তোমার ছায়া হয়ে। তোমার হঠাৎ এভাবে চলে যাওয়া আমরা মেনে নিতে পারিনি বাবা। তবুও ঈশ্বরের ইচ্ছাকে আমরা বিশ্বাসপূর্ণ শ্রদ্ধা জানাই এবং বিশ্বাস করি ঈশ্বর তোমাকে স্বর্গের অনন্তলোকে স্থান দিয়েছেন।

বাবা, আমাদের জন্য ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ বর্ষিত করো যেন তোমার অপরিসীম ভাল গুণাবলীগুলো আমাদের জীবন চলার পথে আঁকড়ে ধরে চলতে পারি।

তোমারই সংসারের শোকার্ত প্রিয়জন -

স্ত্রী	:	দীপ্তি ক্লারা কস্তা
মেয়ে- মেয়ে জামাই	:	মুক্তা-রত্নেশ (আমেরিকা), শিলা-সৌমশী (তেজগাঁও)
ছেলে- ছেলে বউ	:	চন্দন-জুঁই, চয়ন-রজনী (হেঞ্জলী)
নাতি-নাতি বউ	:	তিতি- ভেরোনিকা, রিমন, তুর্য ও জীম
নাতিন-জামাই	:	লাভিনা-রবি, তৌয়া ও ক্লারন
পুতিন	:	নিহোমা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ১৫
২ - ৮ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
১৯ - ২৫ বৈশাখ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

কর্ম ও কর্মীর প্রতি মনোযোগ আবশ্যক

কর্ম বা শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধা জানিয়ে পহেলা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালন করা হয়। বিশ্বের মেহনতি মানুষ বিশেষভাবে নিম্ন আয়ের শ্রমিক, গৃহকর্মী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ যেন তাদের মৌলিক অধিকার ও মানবিক মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকে, জীবনকে উপভোগ করতে পারে এমনটি প্রত্যাশা করেই সারাবিশ্বে শ্রমিক দিবস পালন করা হয়। শ্রমিকেরা প্রতিদিন হাড়ভাঙ্গা খেটে এ বিশ্বকে সচল ও সতেজ রেখেছেন। সুন্দর ও উন্নত বিশ্ব গড়তে এদের ভূমিকাই প্রধান। কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে বিশ্বের অনেক স্থানে এই শ্রমিকেরাই শোষণ, নিপীড়ণ ও বঞ্চনার শিকার হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। বিভিন্ন ছলাকলায় ও কূটকৌশলে সহজ-সরল শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছে শিক্ষিত মালিকশ্রেণীর মানুষেরা। অনেক সময়ই মালিকপক্ষ কর্মীদেরকে নিজেদের বিত্ত-বৈভব বাড়ানোর মেশিন হিসেবে বিবেচনা করেন। ফলশ্রুতিতে কর্মীদেরকে প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে বিভিন্নভাবে খাটিয়ে তাদের কাজটা হাসিল করে নেয়। এ অতিরিক্ত কাজ আদায় করতে তারা কর্মীদেরকে বিভিন্ন সুবিধা দেবার কথা বলে। কিন্তু বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মালিকপক্ষ তাদের কথা রাখেন না। কর্মীদের প্রয়োজন ও চাহিদার দিকে তেমন একটা নজর দেন না।এমনকি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা বা নিরাপদ কর্মপরিবেশও দান করেন না। মনে হয় মালিকদের কাছে কাজটাই বড় মানুষটি নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, একজন শ্রমিক সেও মানুষ। তারও আত্মসম্মানবোধ আছে। তার ন্যায্য অধিকার তাকে দিতে হবে। কর্মের ধরণে বিভাজন থাকাটা স্বাভাবিক কিন্তু প্রত্যেকজন শ্রমিককে শ্রমের যথার্থ মর্যাদা দানে যেন কোন কৃপণতা না থাকে।

কর্মী মর্যাদাবান হতে পারেন তার কর্ম করার মধ্যদিয়ে। যে কাজই হোক না কেন তা দরদ ও ভালবাসা দিয়ে করে প্রতিটি কাজের মাহাত্ম্য তুলে ধরা যায়। কর্মীকে তার সুনির্দিষ্ট কাজ ভালো মতো সম্পন্ন করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। কাজটিকে জীবনাহ্বানের মতো গ্রহণ করতে হবে। দায়সারাভাবে কোন কাজ করলে কাজের সৌন্দর্য ফুটে উঠে না। তাই কর্মের প্রতি প্রত্যেক কর্মীকেই মনোযোগী, বিশ্বস্থ ও তৎপর হতে হবে।

বাংলাদেশের রফতানি আয়ের প্রধান খাত তৈরি পোশাক খাত এবং এরপরেই প্রবাসী শ্রমিক। যারা দেশকে স্বনির্ভর ও অর্থনৈতিকভাবে উন্নত করতে কঠোর পরিশ্রম করছে, সেই শ্রমিকদেরকে আমরা কতটা সম্মানের চোখে দেখি! বর্তমানে দেশে-বিদেশে করোনা পরিস্থিতির শিকার হচ্ছেন শ্রমিকরা। অভিবাসন খাতে এরই মধ্যে কাজ হারিয়েছেন আট লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার শ্রমিক। তারা অনেকে দেশে ফিরে এসেছেন; ফেরার অপেক্ষায় রয়েছে আরো অনেকে। যারা ছুটিতে এসেছিলেন তারাও ফিরতে পারছেন না বিভিন্ন জটিলতার কারণে। প্রথম দফা লকডাউনের প্রকোপ একটু কমার পর কেউ-কেউ কাজে যোগ দিলেও পরিস্থিতি আবার সংকটময় হচ্ছে। করোনাপরবর্তী কেমন ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে তাদের জন্য? ইতোমধ্যেই অনেক শিল্প কারখানা থেকে হাজারো-হাজারো শ্রমিক ছাঁটাই করা হচ্ছে। করোনা পরবর্তী সময়ে শ্রমিকদের প্রতি কেমন আচরণ হবে মালিক পক্ষের বিষয়টি এখনই ভাবাচ্ছে? কাজ না থাকায় মালিকপক্ষেরও উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এমনিতর অবস্থায় কর্মীকে কর্মের প্রতি ও মালিককে কর্মীর প্রতি মনোযোগী হতে হবে। উভয়পক্ষের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকলে এই কালবেলা অতিক্রম করা সম্ভব। নিয়ন্ত্রিত কিন্তু কঠিন পরিশ্রম এবং মালিক-কর্মীর পারস্পরিক হৃদ্যতাপূর্ণ শ্রদ্ধাবোধ প্রতিষ্ঠিত হলে একটি মানবিক সমাজ সৃষ্টি হবে। যে মানবিক সমাজে সকলে একসাথে প্রতিকূলতাকে জয় করতে সক্ষম হবে।

সমাজ, দেশ ও মণ্ডলী গঠনে সবার শ্রমই প্রয়োজন। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করি দেশ ও জাতির জন্য শ্রমিকদের সকল অবদান। দেশের ও প্রবাসের সকল শ্রমজীবী মানুষ নিরাপদে ও শান্তিতে থাকুক। শ্রমিকদের প্রতিপালক সাধু যোসেফ তাদের মঙ্গল করুন। †

আর এই তো তাঁর আজ্ঞা : আমরা যেন তাঁর পুত্র যিশু খ্রিস্টের নামে বিশ্বাস রাখি ও পরস্পরকে ভালবাসি, তিনি যেমন আমাদেরকে আজ্ঞা দিয়েছেন। *- (১ম যোহন ৩:২৩)*

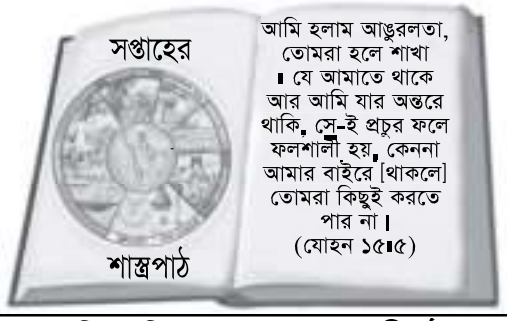

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৫ এপ্রিল - ০১ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

২ মে, রবিবার
শিষ্যচরিত ৯: ২৬-৩১, সাম ২২: ২৬খ-২৮, ৩০-৩২, ১ যোহন ৩: ১৮-২৪, যোহন ১৫: ১-৮

৩ মে, সোমবার
১ করি ১৫: ১-৮, সাম ১৯: ১-৪, যোহন ১৪: ৬-১৪

৪ মে, মঙ্গলবার
শিষ্যচরিত ১৪: ১৯-২৮, সাম ১৪৫: ১০-১৩কখ, ২১, যোহন ১৪: ২৭-৩১ক

৫ মে, বুধবার
শিষ্যচরিত ১৫: ১-৬, সাম ১২২: ১-৫, যোহন ১৫: ১-৮

৬ মে, বৃহস্পতিবার
শিষ্যচরিত ১৫: ৭-২১, সাম ৯৬: ১-৩, ১০, যোহন ১৫: ৯-১১
আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি, ক্রুজ, ওএমআই-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী।

৭ মে, শুক্রবার
শিষ্যচরিত ১৫: ২২-৩১, সাম ৫৭: ৭-১১, যোহন ১৫: ১২-১৭

৮ মে, শনিবার
শিষ্যচরিত ১৬: ১-১০, সাম ১০০: ১-৩, ৫, যোহন ১৫: ১৮-২১

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২ মে, রবিবার
+ ১৯৪৫ ফাদার বি. ভালেন্টিনো বেলজেরি (দিনাজপুর)
+ ১৯৪৬ সিস্টার ইউলালি সিএসসি

৩ মে, সোমবার
+ ১৯০৫ সিস্টার ভিনসেন্ট এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৬৬ ফাদার জেমস মেকগার্ভি সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯২ ব্রাদার জুড কস্তেল্ল সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৭ ফাদার পল গমেজ (ঢাকা)
+ ২০০৮ ফাদার বারট্রেম নেলসন সিএসসি (চট্টগ্রাম)

৪ মে, মঙ্গলবার
+ ১৯৭০ সিস্টার লাওরা থিভার্জ সিএসসি
+ ১৯৯৬ ফাদার বেল্লিনী লুইজি পিমে (দিনাজপুর)

৫ মে, বুধবার
+ ১৯৭১ সিস্টার লিলিয়ান ব্রোনেল সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৫ সিস্টার যোসেফিন হাঁসদা সিআইসি (দিনাজপুর)

৬ মে, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৯৭ সি. বার্থোলমেয় হালদার এসসি (খুলনা)

৮ মে, শনিবার
+ ২০১৬ ব্রাদার জারলাথ ডি' সুজা সিএসসি (ঢাকা)

মাস্ক পড়া কথা

গত ২৪-৩০ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পত্রবিতানে দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজের লিখিত "আসুন মাস্ক পড়ি" লেখাটা যেমন প্রয়োজনীয়, তেমন গুরুত্বপূর্ণও বটে। তিনি এই করোনা ভাইরাস মহামারি কালে, করোনাভাইরাস প্রতিরোধে মাস্ক পড়া নিয়ে যেসব বিষয়বস্তু লেখায় তুলে ধরেছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় বিষয়। তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তবে মাস্ক এর প্রধান বিষয়, মাস্ক, কখন, কোথায় এবং কিভাবে পড়তে হবে, কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তা জানতে হবে। মাস্ক এমন একটি বস্তু, খাবার ছাড়া যেমন জীবন বাঁচে না, তেমন মাস্ক ছাড়া করোনাভাইরাসও বিদায় হয় না।

আমি মাস্ক পড়া নিয়ে এমন একটি সত্য ঘটনার কথা বলতে চাই, আশা রাখি তাতে ছোট-বড় সবারই কল্যাণে আসবে। আমি কিছুদিন আগে সকালে আমার বাড়ির সামনে খালপাড়ের রাস্তা দিয়ে হাটছিলাম। তখন আমার পরিচিত একজন বৃদ্ধ মুসলিম ভাই হেটে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, আসালামু আলাইকুম মাস্টার। আমিও বললাম, ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। আমি হাটছিলাম শারীরিক ব্যায়ামের জন্য, আর মুসলিম ভাই হাটছিলেন বহুমূত্র রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য। মুসলিম ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মাস্টার আপনার মাস্ক কোথায়? আমি কোনো উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আগে বলুন আপনার মাস্ক কোথায়? উত্তর পেলাম, কেন? কানা হয়ে গেলেন নাকি? আমার মাস্ক কোথায় আপনি কি তা দেখতে পাচ্ছেন না? বললাম, ভাই এ বৃদ্ধ বয়সে কানা-কানা ভাবতো হবারই কথা, তবু আমি দেখছি, আপনার মাস্ক নাকেও না, আবার মুখেও না, মাস্ক দেখছি আপনার থোতায়। আপনি কি জানেন না, করোনাভাইরাস থোতা, মাথা আর কপাল দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে না, প্রবেশ করে নাক মুখ দিয়ে। এভাবে আপনার মাস্ক পড়া আর আমার মাস্ক না পড়াও একই কথা। এবার বুঝলেন? এরপর মুসলিম ভাই মাস্ক টেনে নাক-মুখ ঢেকে চলে গেলেন। শ্রদ্ধেয় - শ্রদ্ধেয়া পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ, আমাদের অনেকেরই প্রবণতা, নিজের দোষ চিন্তা না করে অন্যের দোষ খুঁজে বের করা। পবিত্র বাইবেলে যিশুর কথা লেখা, প্রথমে নিজের চোখের কড়িকাঠ বের কর, তাহলে অন্যের চোখের কড়িকাঠ দেখতে পাবে। আসুন আমরা সবাই মাস্ক পড়ি, করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সাহায্য করি॥

মাস্টার সুবল

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

৬ মে, ২০০৫ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই-এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ মে তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছে। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র" ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

করোনাকালে কর্মহীন কর্মীদের করুণ কাহিনী

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

করোনাভাইরাসের আক্রমনের স্থায়িত্ব এতটা দীর্ঘস্থায়ী হবে তা আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষই হয়তো ভাবেনি; কমপক্ষে আমরা কেউ প্রত্যাশা করিনি। কিন্তু ভাবনার ঊর্ধ্বে উঠে করোনাভাইরাস তার দাপট দেখিয়ে যাচ্ছে সগৌরবে অত্যন্ত ভয়ঙ্করভাবে। করোনায় স্বাস্থ্য ও জীবনহানির যেমনি ঝুঁকি রয়েছে ঠিক তেমনি জীবিকা হারানোর ঝুঁকিও রয়েছে। যা ইতোমধ্যে আমাদের দেশেও দৃশ্যমান হয়েছে। বাংলাদেশের সাতষট্টি লাখের বেশি শ্রমিক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করছেন। এরমধ্যে আট লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার শ্রমিক কাজ হারিয়ে দেশে ফেরত এসেছেন এবং অনেকে ফেরার প্রতিক্ষায় রয়েছেন। দেশের অভ্যন্তরেও হাজার হাজার মানুষ কর্মহীন হয়ে বেকার জীবন কাটাচ্ছেন অনেকদিন ধরে। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজে যোগ দিতে পারছেন না অনেকেই। মানুষের জীবন-যাত্রা স্তবির হয়ে যাওয়াতে অনেক ছোট-ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। তাই করোনা মহামারী শুধু মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য নয়, তাদের জীবিকার উপরও থাবা বসিয়েছে। আইএলওর মহাপরিচালক গত বছরই বলেছিলেন, করোনাভাইরাস এখন আর শুধুমাত্র স্বাস্থ্য সংকট নয়। এটি শ্রম ও অর্থনৈতিক বড় সংকটও।

আমরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও মিডিয়াতে দেখেছি করোনার কারণে অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) অনেক শ্রমিকেরা চাকুরিচ্যুত হয়েছেন। গার্মেন্টস, ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স ও সরকারী কাজ - এই চারটি খাত ছাড়া বাকি সবই অনানুষ্ঠানিক খাত। সঙ্গত কারণে দেশের বেশিরভাগ শ্রমজীবী কর্মহীনতা অভিজ্ঞতা করছেন এবং দারিদ্রে পতিত হচ্ছেন। প্রবাসী কর্মী, বিভিন্ন বাসাবাড়িতে কাজ, হোটেল-রেস্টুরেন্টে, প্রসাধন-বিনোদন সেবাকর্মী, দিনমজুর, হকার, পরিবহন শ্রমিক, রিক্সা-টেম্পু-সিএনজি, উবার চালক, দর্জি, নাপিত - এ ধরণের বিভিন্ন পেশার বিপুল সংখ্যক মানুষ কর্মহীন। কিন্তু তাদের পরিবারের খরচতো আর বন্ধ হয়নি। করোনা সংক্রমন রোধে দীর্ঘদিন লকডাউন দেওয়ায় তাদের অবস্থা করুণ থেকে করুণতর হচ্ছে। কাজ করতে চেয়েও করতে না পারা এবং সন্তান, পরিবার-পরিজনের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে না দেবার কি যে কষ্ট তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না। করোনার ১ম ও ২য় উভয় ঢেউয়ের সময়েই আমি কর্মহীন কষ্টগাঁথা দেখেছি। করোনাকালে আমার আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্খীরা সতর্ক করতেন যাতে বাইরে বের না হয়, ঘরে থেকেই যতটা কাজ করা যায়। কিন্তু দায়িত্বের কারণে, করোনাকালে মানুষের কষ্ট অনুধাবন করতে মনের টানে প্রায়ই বের হয়ে যেতাম। পথে ঘাটে দেখেছি কর্মঠ মানুষের কাজ না পাওয়াতে বিরস বদন, শূণ্য ফুটপাতে হকারদের উদাসীন দৃষ্টি। শুনেছি কাল কি খবো জানি না, সাহায্য চাইতেও পারছি না আবার খাবারও যোগার করতে পারছি না, অসুখ হলে চিকিৎসা যে করাবো তার কোন সামর্থ্য নেই। ঈশ্বরের কাছে আহাজারি করে বলছেন, ঈশ্বর এই সময়ে যেন অসুখে না পরি ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঘটনা -১: রিপ্পী ও রোদেলা স্বামী-স্ত্রী; উভয়েই ছোট-খাট কাজ করে সংসার চালায়। স্বামী রেস্টুরেন্টে কাজ করে এবং স্ত্রী মহিলাদের কাপড়-প্রসাধনী বিক্রি করে কিছু আয় করে। ২০২০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস থেকেই স্বামীর চাকুরি নেই এবং স্ত্রীও তেমন কোন অর্ডার পাচ্ছে না। ছেলে-মেয়ের পড়াশুনার কথা চিন্তা করে গ্রামের বাড়িতেও যেতে পারছেন না। কিন্তু বাড়িভাড়া দিতেও হিমশিম খাচ্ছেন। অবস্থা একটু ভালো হলে রিপ্পী অনেকস্থানে ঘুরেও কোন কাজের ব্যবস্থা করতে পারছে না। এমনি সময় আবার সবকিছু বন্ধ। খাওয়া ও পোষাক-আশাকের জৌলুস কমিয়ে কোনরকমে এক বছর ম্যানেজ করেছে। বাড়ন্ত বয়সের দুই ছেলেমেয়ে পর্যাপ্ত খাদ্য না পেয়ে কেমন যে নেতিয়ে পরছে। গ্রামের বাড়িতেও বাড়ি ছাড়া আর কিছু নেই। কি করবে রিপ্পী-রোদেলা বুঝতে পারছে না।

ঘটনা- ২: একজন ফাদার সহভাগিতা করে বলছিলেন, তার গ্রামের অনেক মানুষ মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করেন। প্রত্যেক জনের পরিবারেই স্বাভাবিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। করোনার প্রাথমিক ধাক্কা প্রথমদিকে তাদেরকে খুব একটা স্পর্শ করতে পারেনি। ভেবেছিল করোনা কেটে গেলে শিঘ্রই বিদেশে ফেরত যাবে এবং স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসবে। তাই তারা তাদের জমানো টাকা খরচ করে পরিবার পরিজন নিয়ে খেয়ে-দেয়ে আরামেই কাটাচ্ছিল। খাওয়া-দাওয়া ও ঘুরাফেরায় অনেক টাকা খরচ করে ফেলায় ৫/৬ মাস পরে কপালে কিছু চিন্তার ভাজ পড়ে। কর্মক্ষেত্রে যোগাযোগ করলেও শুধু অপেক্ষা করতে বলে। দিন গিয়ে মাস গেলেও কাজে যোগ দিতে পারছেন না। পরিবারে আর কোন কর্মক্ষম ব্যক্তি না থাকায় আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ধার-দেনা করে চলতে থাকেন। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার খরচ চালাতেও হিমশিম খাচ্ছে। মরার ওপর খাড়ার ঘা হয়ে স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। করোনা ঢেউ এর কারণে হাসপাতালগুলোতে ভর্তি করা যাচ্ছে না আবার প্রাইভেট ক্লিনিকে চিকিৎসা চালানোও প্রচুর ব্যয়সাধ্য। মিশনের ঋণদান সমবায় সমিতিতে লোন করে টাকা তুলে স্ত্রীর চিকিৎসা করিয়ে যে টাকা ছিল তা দিয়ে দু'মাস চলছে। এখন সংসার চালানোর মতো অর্থও তার নেই। জমি বা স্ত্রীর সোনার গহনা বিক্রি করা ছাড়া তার কোন উপায় নেই। কিন্তু এ দুটোও কেউ ন্যায্য মূল্যে এখন কিনতে চাচ্ছে না। তাই উপান্তর না পেয়ে সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে তিনি ফাদারের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছেন। ফাদার জানালেন, ঐ লোকই শুধু নয় এ ধরণের আরো ৭/৮জন তাকে অনুরোধ করেছে কিছুটা সাহায্য করতে। ফাদারের মুখাবয়বে তাকিয়ে বুঝলাম তিনি ঐ লোকদের করুণ আর্তি হৃদয়াঙ্গম করেছেন। মুখ নামিয়ে ক্ষীণ স্বরে বললেন, সবাইকে সাহায্য করার সামর্থ্য তো আমার নেই। অদেখা সেই হাজারো প্রবাসী কর্মী যারা দেশে এসে কর্মহীন হয়ে পড়েছে তাদের করুণ চাহনি আমার মানসপটে ভেসে ওঠছে আর কষ্ট দিয়ে যাচ্ছে।

ঘটনা-৩: ২৭ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দে দ্য ডেইলী স্টার অনলাইন পত্রিকায় প্রকাশ, গত ৫ এপ্রিল থেকে করোনা সংক্রমন রোধে সারাদেশে গণপরিবহন বন্ধ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় ৫০ লাখ সড়ক পরিবহন শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। তাদের বেঁচে থাকার মতো অবলম্বন নেই। উপার্জনের পথ বন্ধ থাকায় পরিবহন শ্রমিকেরা পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। পরিবার-পরিজন নিয়ে অর্ধাহারে-অনাহারে থাকার যন্ত্রণা পরিবহন শ্রমিকদের কাছে করোনা সংক্রমনের ভয়ের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। কিছুদিন আগে প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সদরঘাটে লঞ্চ চলাচল না করায় সেখানকার ভাসমান হকার ও মুটেরা একবেলা খেয়ে দিন পার করছে।

এমনিভাবে আরো শত-শত করুণ কাহিনী তুলে ধরা সম্ভব। কিন্তু করোনা যেন আমাদেরকে করুণ করে দিতে না পারে সেজন্য আমাদেরকে পদক্ষেপ নিতে হবে। তাৎক্ষণিক সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য সরকারসহ বিত্তবানদের এগিয়ে আসতে হবে কর্মহীন মানুষকে খাদ্য সহায়তা ও নগদ অর্থ অনুদানের ব্যবস্থা করে দিয়ে সর্বস্তরের মানুষজনকে স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। একা আমরা কেউ নিরাপদ নই, সকলে মিলেই নিরাপত্তা বলয় তৈরি করবো- এ মনোভাব দৃঢ় করতে হবে। ভোগ-বিলাসিতা কমিয়ে প্রকৃতির যত্ন নিয়ে করোনাভাইরাস মোকাবেলায় আমরা প্রত্যেকেই সক্রিয় যোদ্ধা হতে পারি ॥

ঐশ আজ্ঞা পালনে চিরবিশ্বস্ত নীরব কর্মী সাধু যোসেফ

রনেশ রবার্ট জেত্রা

ঈশ্বর ভালোবাসাময় এবং ক্ষমাশীল পিতা। তাই তিনি আমাদেরকে পাপ থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করেছেন। সেই পরিত্রাণের মহাপরিকল্পনা তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র যিশু খ্রিস্টকে দিয়ে বাস্তবায়িত করেছেন এবং এই মর্ত্যজগতে তিনি সাধু যোসেফ ও মা-মারিয়াকে তাঁর পরিত্রাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশী করে তুলেছেন। তাঁদেরকেই তিনি এ কাজে বেছে নিলেন। তাঁরাও ঈশ্বরের ইচ্ছাকে মাথা পেতে মেনে নিলেন।

পবিত্র বাইবেলে মারিয়া সম্পর্কে যতটুকু লেখা রয়েছে, সাধু যোসেফের বিষয়ে তেমন কিছু লেখা পাওয়া যায় না। তাই বাইবেলে সাধু যোসেফের কোনো একটি মুখের ভাষ্যও শোনা যায় না। তবে তাঁর সম্পর্কে যতটুকু বলা হয়েছে তা থেকে বিশ্লেষণ করে প্রমাণীত এবং স্বীকার করে নিতে হয় যে, মানব মুক্তির ইতিহাসে সাধু যোসেফের ভূমিকা অসামান্য। কারণ, তিনি যদি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে গ্রহণ না করতেন তাহলে হয়তো মুক্তির ইতিহাসের মোড় ঘুরে যেতে পারতো। সাধু যোসেফ তাঁর জীবনের স্বাধীনতাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে বিসর্জন দিয়েছেন।

রোমান দার্শনিক সেনেকা বলেছেন, "যিনি ঈশ্বরের বাধ্য হন, তিনিই স্বাধীন।" সেক্ষেত্রে সাধু যোসেফ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন মানুষ ছিলেন। কারণ, তিনি সারাজীবন ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে চির বিশ্বস্থ এবং বাধ্য ছিলেন। কোনো জায়গায় লেখা পাওয়া যায় না যে, তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা বা আজ্ঞা অগ্রাহ্য করেছেন। আমরা সাধু মথির লেখা মঙ্গলসমাচারে দৃষ্টিপাত করলে তার প্রমাণ পেতে পারি। সাধু মথির লেখা মঙ্গলসমাচারে (১:১৯) পদে সাধু যোসেফকে একজন ধর্মনিষ্ট মানুষ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। সত্যিকার অর্থেই তিনি ধর্মনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। তাঁর জীবনকর্মে আমরা তার প্রমাণ পাই যে, তিনি তাঁর জীবন ও কাজে ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পিতা ঈশ্বরের ধার্মিকতার সব দাবি পূরণ করেছেন। সাধু যোসেফের প্রতি স্বর্গদূতের মধ্যদিয়ে ঈশ্বর যা করতে আজ্ঞা দিয়েছিলেন তা তিনি বিশ্বস্তভাবে এবং নীরবতায় পালন করেছেন। ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে তিনি কোনো অজুহাত দেখাননি *(মথি ১:২০-২৫)*। জীবন বাস্তবতায় দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, কোনো কাজ বা দায়িত্ব নিজের পছন্দ এবং স্বার্থসিদ্ধি হাসিল করার সম্ভাবনা না থাকলে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কাছে এবং যারা আমাদের দায়িত্ব দিয়ে থাকেন, তাদের কাছে আমরা অনেক সময় অজুহাত এবং শর্ত দিয়ে বসি যে, কাজটি করলে বিনিময়ে আমি কি পাব কিংবা আমি কাজটা করলে আমার কি লাভ হবে? অথচ সাধু যোসেফের জন্য ঈশ্বরের দেওয়া কাজটি কত যে কঠিন ছিল, তা অভিজ্ঞতা না করলে বুঝা যায় না। তবুও তিনি তা নীরবে মাথা পেতে নিয়েছেন এবং তা বিশ্বস্তভাবে পালন করেছেন।

সাধু মথি রচিত মঙ্গলসমাচারে *(২:১৩-১৫)* দেখতে পাই যে, সাধু যোসেফ স্বর্গদূতের নির্দেশে শিশু যিশুকে রাজা হেরোদের হাত থেকে প্রাণে বাঁচানোর জন্য মিশর দেশে রাতের বেলা পালিয়ে গিয়েছিলেন। ধারণা করা হয় যে, বেথলেহেম থেকে মিশর দেশের দূরত্ব ছিল প্রায় ৬৯০কি.মি.। পথগুলোও ছিলো পাহাড়ি দুর্গম এবং মরুপ্রান্তর। সেই পথ অতিক্রম করেই সাধু যোসেফ মিশর থেকে নাজারেথে আবার প্রত্যাবর্তন হয়েছিলেন *(মথি ২:১৯-২৩)*। সেখানেও তিনি কোনো কথা অর্থাৎ,বিনা বাক্য ব্যয়ে নীরবেই ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করেছেন। তিনি যে, প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে চিরবিশ্বস্ত এবং নীরব কর্মী ছিলেন তা আমরা তাঁর কর্মের মধ্য দিয়ে বুঝতে পারি।

"ও কি সেই ছুতোরের ছেলে নয়? *(মথি ১৩:৫৫)* বাইবেলের এই উক্তিটির মধ্যদিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে, সাধু যোসেফ পেশায় ছিলেন একজন কাঠ মিস্ত্রী (ছুতোর এর অর্থ কাঠ মিস্ত্রী)। যে পেশাকে তৎকালীন ইহুদী সমাজে নগন্য কাজ হিসেবে দেখা হতো। কিন্তু সাধু যোসেফ সেই নগন্য কাজটিই বিশ্বস্থতার সাথে করেছেন। এভাবে তিনি তাঁর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কাজগুলো নীরবে এবং বিশ্বস্থভাবে করে আজ মণ্ডলীতে আমাদের কাছে আদর্শ হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। প্রকৃতপক্ষে, স্মরণীয় হয়ে থাকতে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে তা মানুষের কাছে প্রচার করতে হয় না, বরং আমাদের করণীয় কাজগুলো বিশ্বস্তভাবে এবং নীরবে করলে ক্ষুদ্র কাজও মহৎরূপে মানুষের চোখে ধরা দেয়। অর্থাৎ, আমার/আপনার কর্মই আমাদের জীবন সাক্ষ্য বহন করবে। পৃথিবীতে অনেকেই সাধু যোসেফের মতো নীরবে-নিভৃতে কল্যাণকর কাজ করে চলেছেন, যারা মানুষের দৃষ্টির অগোচরে রয়ে গেছেন। কিন্তু মহৎ কাজ কখনো চাপা থাকে না। একদিন না একদিন তা প্রকাশ পাবেই। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় মনে হয় যে, দেখানোর প্রবণতা সর্বত্রই লক্ষণীয়। এখন সবাই দু-একটি কাজ করে মানুষের প্রশংসা কুড়োতে বেশি ভালোবাসেন। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধর জন্য দু-এক পয়সা খরচ করে মানুষের চোখের নজরে আসার জন্য বা মানুষের বাহবা পাওয়ার জন্য মিডিয়া থেকে শুরু করে বর্তমান নগর জীবনের মানুষ কতো কিছুই না প্রচার-প্রচারণা করে থাকে । নিজ দায়িত্ববোধ থেকে কোনো কাজে হাত বাড়িয়ে দেওয়ার মানুষ বর্তমান বাস্তবতায় খুব অল্প সংখ্যকই দেখা যায়।

আমরা সবাই কোনো না কোনোভাবে একজন শ্রমিক। শ্রমিক দিবসে সকল শ্রমিকদেরকে শুভেচ্ছা জানাই। সেই সাথে সকল শ্রমজীবি ভাই-বোনদের জন্য, সর্বোপরি সবাইকে আহ্বান করি, আসুন আমরা বিনাশর্তে ও সর্বদা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে গ্রহণ করে, নিজেদের দায়িত্ববোধ থেকে নীরবে এবং বিশ্বস্থভাবে সাধু যোসেফের আদর্শে আমাদের করণীয় কাজগুলো করতে চেষ্ট করি॥

সহায়ক গ্রন্থ:

১. পবিত্র মঙ্গলবার্তা
২. দ্বিমাসিক মঙ্গলবার্তা-১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ

শ্রেষ্ঠ পিতা ও বিশুদ্ধ স্বামী সাধু যোসেফ

সিস্টার মেরী অরিলিয়া এস এম আর এ

মানবেশ্বর খ্রিস্ট স্বয়ং যাকে দেখালেন পিতৃকল্প সম্মান, খ্রিস্ট জননী নারীকূল কান্তি বিশ্বমাতা মারীয়া যাকে দিলেন পত্নী প্রেমের নির্মল হৃদয়ের ভক্তি-শ্রদ্ধা, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা যাকে দিলেন পরিবারের

সর্বময় কর্তা হওয়ার ও আর্দশ পরিবারের যোগ্যতা । তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ পিতা ও বিশুদ্ধ স্বামী সাধু যোসেফ। সত্যিই সাধু যোসেফের সম্মান ও গৌরব বিপুল এবং তা চিরন্তন বটে। তিনি ঈশ্বরের মনোনীত ভক্ত, ধন্যা কুমারী মারীয়ার বিশুদ্ধ স্বামী, খ্রিস্টের পালক পিতা, এবং খ্রিস্ট মণ্ডলীর ও সন্ন্যাসী কুমারীদের রক্ষক। সাধু যোসেফের শ্রেষ্ঠত্ব তার চরিত্রের বহুমুখী পুণ্যগুন রাশির দীপ্তি বিকাশেরই প্রতিফলন। ব্যক্তিগত দিক দিয়ে তিনি যিশুর পিতা না হলেও খ্রিস্ট জননীর আর্দশ স্বামী হিসেবে তাদের পালনকারী রক্ষাকারী। তাই তো তিনি ত্যাগময় একটি আদর্শ পরিবার গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। সাধু যোসেফের মহান যে চরিত্র গুণালংকারে বিভূষিত ছিল, তন্নধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তাঁর ঐশ্বেচ্ছাধীনতা, কৌমার্যদীপ্ত, অনাবিল বিশুদ্ধতা, বিশ্বস্ততা, সাহসীকতা, ধৈর্য্যশীলতা ও কতর্ব্য নিষ্ঠতা। তিনি শিশু যিশুকে ও মা মারিয়াকে সমস্ত বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেছেন। বিশেষভাবে শিশু যিশুকে হেরোদের রোষানলের মুখ থেকে রক্ষা করতে মিশরে পালিয়ে গিয়েছেন, পথিমধ্যে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন, বিপদ, সংকট উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করে। মারিয়ার সুনাম ও শুচিতা রক্ষায় তিনি ছিলেন অনন্য। খ্রিস্টের ও মারীয়ার ভরণ-পোষণ, অভাব অনটন পূরণ করতে তিনি ছুঁতোর কাজ করেছেন। এ কারণে ঐশ পিতা তাকে বিশ্বস্ততার প্রতিদান স্বরূপ দিয়েছেন মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্তে মাতা ও পুত্রের আবেগময় আলিঙ্গন ও তৃপ্তির অশেষ আনন্দ। তাই তো আমরা ভলো মৃত্যুর জন্য সাধু যোসেফের কাছে প্রার্থনা করি। সাধু যোসেফ হলেন আদর্শ বীর, তিনি মা মারিয়া ও পুত্রকে নিয়ে মন্দিরে যান কিন্তু সেখানে পুত্র যিশুকে হারিয়ে ফেলেন। তিন দিন পর তাকে ফিরে পান। কিন্তু তাতেও তার মুখমন্ডলে ভেসে উঠেনি কোন কুটুক্তির ছাপ। মহা মন্দিরে সিমিয়োনের ভবিষ্যৎবাণী শুনেও তা অন্তরে পোষণ করেছেন। কিন্তু খ্রিস্টের মহিমা প্রকাশের সময় তিনি আর বেঁচে রইলেন না, আশ্চর্য কাজ সম্পাদনের পূর্বেই তিনি চোখ বুঝলেন। অর্থাৎ জীবনের সমাপ্তি লগ্নে মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন।

বিপর্যয়ের নগর দোলায় কেটেছে সাধু যোসেফের জীবন। বিভিন্ন ভয়, দুশ্চিন্তা, হতাশা-নিরাশা থাকলে ও তাঁর অন্তরে ছিল অক্ষয় আনন্দ। কারণ জীবনের প্রতিক্ষণেই তিনি পেয়েছেন ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ও আশীর্বাদ। সর্বদা ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে মেনে চলাই ছিল তাঁর পরমানন্দ। তাই তো তিনি স্বপ্নাদর্শন করে তা মেনে নিয়ে সেভাবেই জীবন-যাপনে অগ্রসর হয়েছেন। সমগ্র মানবের প্রতি দেখিয়েছেন সার্বজনীন, সাবলীল ও সংহত ভক্তি-ভালবাসা। সাধু যোসেফ আজো বিশ্বমন্ডলীর সার্বজনীন রক্ষক, মণ্ডলীর আচার্যগণের গুরু, শ্রমজীবিগণের নেতা, আদর্শ পবিত্র পরিবারের চালক, সকল কুমারী সন্ন্যাসীগণের প্রতিপালক । তাই আজ সমগ্র বিশ্ব মণ্ডলী সাধু যোসেফকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছে, এবং জীবনাদর্শ হিসেবে বেছে নিচ্ছে তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের আদর্শ। কারণ তিনি হচ্ছেন মানব জগতের উজ্জ্বল ধ্রুবতারা। তাই সাধু যোসেফের এই পর্বদিনে সাধু যোসেফ যাদের প্রতিপালক তাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন॥

৩৪তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত পল পালমা

জন্ম : ০২-১২-১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ০৩-০৫-১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ

দক্ষিণ ভাদার্তী, তুমিলিয়া মিশন

দেখতে দেখতে ৩৪টি বছর পার হয়ে গেল। যদিও আজ তুমি নেই তবু আমাদের জীবনে তোমার অভাব এখনও প্রকট। প্রার্থনা করি পরম পিতার কাছে তুমি শান্তিতে থেকে আমাদেরকে আশীর্বাদ করবে যেন, তোমার আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হই। ঈশ্বর তোমার আত্মাকে অনন্তধামে চিরশান্তি প্রদান করুন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্ত্রী : ডরথী আর. পালমা

ছেলে-ছেলে বৌ : সুজিত-রত্না, সুধীর-ওয়েস্তি

মেয়ে-মেয়ে জামাই : পাস্কা-মৃত জেম্‌স অরুণ, মালতী-জন, রীনা-পরিমল, রীটা-মাইকেল

নাতি-নাতনী : রনা, অংকন, অর্পণ, শাওন, তূরী, বেনডেন, ইলেন, স্তুতি, আর্চি ও এমিলিন পালমা।

বিজ্ঞ/১২৪/২১

পোপ ফ্রান্সিসের প্রৈরিতিক পত্র: ‘এক পিতার হৃদয় দিয়ে’ এর আলোকে ধারণাপত্র ও অনুধ্যান

সংকলনে : মানিক উইলভার ডি’কস্তা

(পূর্ব প্রকাশের পর)

৫) এক অভিনব সাহসী পিতা

প্রকৃত পুনর্মিলনের জন্য যেমন প্রাথমিকভাবে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন ইতিহাসকে গ্রহণ করা প্রয়োজন, প্রয়োজন জীবনের অনাকাঙ্খিত অবস্থা ও সময়কে আলিঙ্গন করা, তেমনি প্রয়োজন অভিনব সাহস। জীবনের জটিলতাগুলো আমরা কিভাবে মোকাবিলা করছি, তা থেকেই প্রকাশিত হয় আমাদের অভিনব সাহসী মনোভাব। জটিলতায় আমরা হাল ছেড়ে দিতে পারি, এড়িয়ে যেতে পারি; আবার জটিলতাগুলো সাহসের সাথে মোকাবেলাও করতে পারি। জীবনের কঠিন ও জটিল অবস্থা আমাদের অমিত সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে, যা আমরা কখনো হয়তো কল্পনাই করিনি।

যিশুর জন্মকাহিনী যখন আমরা পড়ি, মাঝে-মাঝে হয়তো ভাবি, কেন ঈশ্বর সরাসরি কাজ করেন না। তথাপি ঈশ্বর কিন্তু ঘটনা এবং মানুষের মধ্যদিয়েই কাজ করেছেন। যোসেফ হচ্ছে প্রকৃত ‘‘আশ্চর্য কাজ”, যাকে পরমেশ্বর শিশু যিশু ও মারিয়াকে রক্ষা করার জন্য মনোনীত করেছেন, ঈশ্বর সরাসরি যিশু ও মারিয়াকে রক্ষা করেননি। যোসেফের অভিনব সাহসে ঈশ্বর আস্থা রেখেছেন। বেথলেহেমে পৌঁছে কোন সরাইখানায় জায়গা না পেয়ে যোসেফ নিজের বিবেচনা ও সাহসেই একটি আস্থাবল বেছে নিলেন, এবং একেই ঈশ্বর পুত্রকে জগতে স্বাগত জানানোর গৃহে রূপান্তরিত করেন *(দ্র: লুক ২: ৬-৭)*। হেরোদের মাধ্যমে যিশুর মৃত্যুভয় ছিল, কিন্তু যোসেফের মাধ্যমে ঈশ্বর তাকে আবার রক্ষা করেন *(দ্র: মথি ২: ১৩-১৪)*।

জাগতিক ক্ষমতার অহংকার ও সহিংসতার মধ্যেও ঈশ্বর পরিত্রাণ কাজ চলমান রাখার পথ ঠিকই খুঁজে নেন। মাঝে-মাঝে মনে হতে পারে, আমাদের জীবন হয়তো ক্ষমতাবানদের দয়ার হাতেই পড়ে আছে; কিন্তু মঙ্গলসমাচার আমাদের উপলব্ধি করায়, প্রকৃতপক্ষে কে আমাদের রক্ষা করতে পারেন। ঈশ্বর সবসময়ই আমাদের রক্ষা করার পথ বের করেন, যদি আমরা নাজারেথের কাঠমিস্ত্রির মত অভিনব সাহস দেখাতে সক্ষম হই, যিনি পরমেশ্বরের অনুগ্রহে বিশ্বাস করে একটি সমস্যাকে সম্ভাবনায় রূপান্তর করতে জানতেন।

মাঝে-মাঝে এমন মনে হয় যেন ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করছেন না, এর মানে এই নয় যে ঈশ্বর আমাদের ভুলে গিয়েছেন; কিন্তু তিনি চান আমরা যেন পরিত্রাণ পরিকল্পনায় বিশ্বাস রাখি, সৃষ্টিশীল হই, এবং সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার পথ নিজেরা খোঁজার চেষ্টা করি। এমন সৃষ্টিশীলতার উদাহরণ আমরা দেখি বাইবেলের সেই একদল লোকের মধ্যে, যারা তাদের পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীকে ভিড়ের জন্য যিশুর কাছে নিতে পারছিলেন না। শেষে তারা যিশু যে ঘরে আছেন সেই ঘরের ছাদের টালি সরিয়ে খাটিয়া সহ তাকে যিশুর সামনে নামিয়ে দিলেন। *(দ্র: লুক ৫: ১৭-২০)*। আর পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে যারা এনেছেন, “তাঁর প্রতি তাদের এমন বিশ্বাস দেখে” *(দ্র: ৫:২০)* যিশু লোকটির পাপ ক্ষমা করেন।

মিশরে কত সময় মারিয়া, যোসেফ ও যিশুর থাকতে হয়েছে, মঙ্গলসমাচারে তা লেখা নেই। কিন্তু অবশ্যই সেখানে তাদের খেতে হয়েছে, একটি ঘরের ব্যবস্থা করতে হয়েছে, সংসার চালাতে কাজ করতে হয়েছে। পুণ্য পরিবারকে আমাদের পরিবারের মতই জাগতিক অবস্থা ও চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। দূর্ভাগ্য ও ক্ষুধার হাত থেকে বাঁচতে আজ যারা বিভিন্ন দেশে ঝুঁকি নিয়ে শরনার্থী হয়েছে, বিশেষভাবে তাদের মত পুণ্য পরিবারকেও একই ভাগ্য বরণ করতে হয়েছে। যুদ্ধ, ঘৃণা, নির্যাতন ও দারিদ্রের কারণে জন্মভূমি ছেড়ে অন্য দেশে শরনার্থী হওয়া মানুষের জন্য সাধু যোসেফকে পোপ ফ্রান্সিস বিশেষ প্রতিপালক বলে বিবেচনা করেন।

আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা হওয়া উচিত– আমরা নিজেরা কি যিশু ও মারিয়াকে রক্ষা করছি, খ্রিস্টিয় রহস্যে যিশু ও মারিয়াকে তো আমাদের দায়িত্বেই দেয়া হয়েছে। চরম অসহায় অবস্থায় ঈশ্বর পুত্র আমাদের জগতে এসেছেন। যোসেফের মাধ্যমে তাকে সুরক্ষা ও যত্ন পেতে এবং বেড়ে উঠতে হয়েছিল। মারিয়া যেখানে মণ্ডলীর মাতা হিসেবে মণ্ডলীর সুরক্ষা নিশ্চিত করছেন, যোসেফ সেখানে প্রতিনিয়ত শিশু যিশু ও মারিয়াকে সুরক্ষা দিয়েছেন, এবং আমরাও মণ্ডলীর প্রতি ভালবাসায় প্রতিনিয়ত শিশু যিশু ও মা-মারিয়াকে ভালবেসে চলেছি। সেই শিশুই একদিন বলবে, “আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমার এই তুচ্ছতম ভাইদের একজনেরও জন্যে তোমরা যা-কিছু করেছো, তা আমারই জন্যে করেছো” *(মথি ২৫: ৪০)*। প্রকৃত অর্থে, প্রত্যেক দরিদ্র, অভাবী, কষ্টভোগী ও মৃত্যুপথ যাত্রী, প্রত্যেক শরনার্থী, প্রত্যেক বন্দী, প্রত্যেক অসুস্থ ব্যক্তি হচ্ছেন “শিশু যিশু” যাকে যোসেফ প্রতিনিয়ত রক্ষা করেন। যোসেফের কাছ থেকে একই যত্ন ও দায়িত্ব নেয়ার শিক্ষা আমরা পাই। আমাদের উচিত এইসব মানুষকে ভালবাসার মাধ্যমে শিশু যিশু ও মা-মারিয়াকে ভালবাসা, পুণ্য সংস্কার ও দয়ার কাজকে ভালবাসা, মণ্ডলী ও দরিদ্রদের ভালবাসা। এই সব মানুষ ও জীবন অবস্থাই-তো শিশু যিশু ও তার মা মারিয়া।

৬) এক শ্রমিক পিতা

সাধু যোসেফ একজন কাঠমিস্ত্রি ছিলেন, সৎ পথেই তার পরিবারের জন্য উপার্জন করেছেন। তার কাছ থেকে যিশু কর্মের মহত্ত্ব ও মর্যাদা শিখেছেন, সৎভাবে রুটি ও রুজি যোগাড় করার আনন্দ কি তা উপলব্ধি করেছেন।

বর্তমান সময়ে ‘বেকারত্ব’ একটি সামাজিক ব্যাধি। যদিও শত-শত বছর ধরে বিভিন্ন দেশ ও জাতি উন্নতির পথে হাঁছে, তথাপি বর্তমানে বেকারত্ব চরম আকার ধারণ করেছে। মর্যাদাপূর্ণ কাজ বা পেশার নিশ্চয়তা বিধান করার উদ্দেশ্যে অনেক উদ্যোগ নেয়ার এখনো প্রচুর অবকাশ আছে।

কর্মের মাধ্যমে মানুষ পরিত্রাণ কাজে অংশগ্রহণ করে। যে পরিবারে কারো কাজ নেই, সে

পরিবার জটিলতা, দুশ্চিন্তা এবং পরিবার ভাঙ্গনের হাতে নিতান্ত অসহায়। প্রত্যেকে যেন বেঁচে থাকার মত উপার্জন করতে পারে তা নিশ্চিত না করে কিভাবেই বা আমরা মানব মর্যাদার কথা বলতে পারি?

কর্মজীবি মানুষ, তা তার পেশা যা-ই হোক না কেন, স্বয়ং ঈশ্বরের সহকর্মী এবং কোন না কোনভাবে আমাদের চারপাশের জগতে বহু কিছুর সৃষ্টিকর্তা। বর্তমান সংকট যা আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনকে প্রভাবিত করছে, তা পুনরায় আমাদের কর্মের মর্যাদা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কার করার আহ্বান জানায়, যাতে নিশ্চিত হয় এক 'নব্য স্বাভাবিক' অবস্থা (New Normal), কেউই যে অবস্থার বাইরে নয়। কোভিড-১৯ মহামারীজনিত কারণে বিশ্বব্যাপী অনেক ভাই ও বোনের কর্মহীনতা আমাদের সামগ্রিক অগ্রাধিকার ও মনযোগ পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানাচ্ছে। সাধু যোসেফকে মিনতি জানাই, আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় দান করো, যেন কোন যুব, কোন ব্যক্তি, কোন পরিবার কর্মহীন না থাকে, সেই উদ্দেশ্য যথ াসাধ্য চেষ্টা করে যেতে পারি।

৭) ছায়ার মত এক পিতা

যিশুর সাথে যোসেফের পারিবারিক সম্পর্কে তিনি ছিলেন স্বর্গীয় পিতার পার্থিব ছায়ার মত। তিনি তাকে চোখে চোখে রেখেছেন, তাকে রক্ষা করেছেন এবং নিজের খেয়াল খুশী মত না চলতে পরিচালনা দান করেছেন। মরুপ্রান্তরে ইস্রায়েলের প্রতি মোশীর উক্তি আমরা স্মরণ করতে পারি, "মরু এলাকায়... তোমরা তো দেখেছ, বাবা যেমন ছেলেকে কোলে করে নিয়ে যান তেমনি করে এই জায়গায় না পৌঁছানো পর্যন্ত তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুও সারাটা পথ তোমাদের বয়ে নিয়ে এসেছেন" *(দ্বিতীয় বিবরণ ১: ৩১)*। একইভাবে, যোসেফ জীবনব্যাপী যিশুর পিতা হয়েই ছিলেন।

পিতার জন্ম হয় না, পিতা গড়ে ওঠে। জগতে এক মানব শিশুর জন্ম দিয়েই পুরুষ বাবা হয়ে যায়না। কিন্তু সন্তানের প্রতি যত্ন ও দায়িত্ব পালনেই পুরুষ পিতায় রূপান্তরিত হয়। যখনই কোন মানুষ অন্য কারো জীবনের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করে, কোন না কোনভাবে সে ঐ ব্যক্তির পিতায় রূপান্তরিত হয়।

আজ অনেক শিশু আছে যারা পিতৃহীন। মণ্ডলীতে অনেক পিতা প্রয়োজন। "খ্রিস্টিয় জীবনে তোমাদের পথ দেখাবার মতো হাজার হাজার লোক থাকতে পরে, কিন্তু তোমাদের পিতা এই একজন।" *(১ করি ৪: ১৫)* সাধু পলের এই উক্তির সাথে প্রত্যেক বিশপ ও যাজকের এই কথা যোগ করার সক্ষমতা থাকা প্রয়োজন, "মঙ্গলসমাচারের মাধ্যমে খ্রিস্ট যিশুতে আমি তোমাদের পিতা হয়েছি"। যেভাবে সাধু পল গালাতীয়দের সন্তান ডেকেছেন "আমার স্নেহের সন্তানেরা, তোমাদের কথা ভেবে আমি যেন আবার প্রসব-বেদনায় কাতর; যতদিন না তোমাদের অন্তরে স্বয়ং খ্রিস্ট মূর্ত হয়ে ওঠেন, ততদিনই কাতর থাকব আমি!" *(৪: ১৯)*।

জীবন ও বাস্তবতার সাথে সন্তানকে পরিচয় করানোই পিতৃত্বের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাদেরকে পিছু টানা নয়, অতিরিক্ত অধিকারে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা নয়। কিন্তু সন্তান যেন নিজেদের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে, স্বাধীনতা উপভোগ করতে এবং নতুন সম্ভাবনা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়, সেইমত সন্তানকে গড়ে তোলাই প্রকৃত পিতার কাজ। যোসেফকে সবচাইতে পুণ্য পিতা বলা হয়। পুণ্য পিতার প্রকাশ শুধু মমতায় নয়, কিন্তু প্রকাশিত হয় সন্তানকে অধিকার করে রাখার মানসিকতা হতে মুক্তিতেই। পুণ্য ভালবাসা অধিকার ত্যাগ করে। পুণ্য ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা। ভালবাসায় যখন অতিরিক্ত অধিকারবোধ কাজ করে, তখন তা প্রিয়জনকে বন্দী করে, সীমাবদ্ধ করে এবং জন্ম দেয় সীমাহীন যাতনার। ঈশ্বর আমাদের পবিত্র ভালবাসায় আলিঙ্গন করেছেন; তিনি এমনকি আমাদের বিপথে যাওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন, তার বিরুদ্ধাচারণ করার স্বাধীনতাও দিয়েছেন। ভালবাসার যুক্তি হলো স্বাধীনতায়, আর যোসেফ জানতো কিভাবে অনন্য স্বাধীনতা দিয়ে ভালবাসতে হয়।

যোসেফ শুধু আত্মত্যাগেই জীবনের সুখ উপলব্ধি করেননি, তিনি আত্মঅনুগ্রহেই সুখ খুঁজে পেয়েছিলেন। তার জীবনে আমরা কখনো হতাশা দেখি না, দেখি শুধু অগাধ বিশ্বাস। আমাদের পৃথিবীতে পিতার মত মানুষ দরকার। নিজের প্রয়োজনে কারো জন্য কিছু করার মানসিকতাপূর্ণ ধূর্ত মানুষ মানবতার কাজে আসে না। যারা কর্তৃত্বকে কর্তৃত্বপরায়নতা, সেবাকে দাসত্ব, আলোচনাকে বিরোধ, দয়াকে উন্নয়ন মনোভাব, ক্ষমতাকে ধ্বংসের পথ বলে ভুল করে, পৃথিবী তাদের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে। আত্মঅনুগ্রহেই প্রকৃত আহ্বান উন্মোচিত হয়, যা হলো পরিণত আত্মত্যাগেরই ফল। আমাদের আহ্বান পরিবার, যাজকত্ব বা উৎসর্গীকৃত জীবন যা-ই হোক না কোন, আমাদের আত্ম অনুগ্রহ কখনোই পূর্ণতা পাবে না যদি তা শুধু আত্মত্যাগেই যথেষ্ট হয়েছে বলে থেমে যায়। সেক্ষেত্রে আমাদের জীবন সৌন্দর্য এবং ভালবাসাময় আনন্দের প্রকাশ না হয়ে অসুখী, ব্যথিত এবং হতাশাপূর্ণ জীবনবোধ তৈরীর ঝুঁকিতে পড়ে যাবে।

আমরা সবাই যোসেফের মতই আমাদের স্বর্গীয় পিতার ছায়া, যিনি সৎ-অসৎ সকলেরই জন্যে ফুটিয়ে তোলেন তাঁর সূর্যের আলো, আর ধার্মিক অধার্মিক সকলেরই ওপর তিনি নামিয়ে আনেন তাঁর বৃষ্টিধারা *(দ্রঃ মথি ৫: ৪৫)*।

পালকীয় পত্রের শেষাংশে পুণ্য পিতা লিখেছেন, তার পালকীয় পত্রটির উদ্দেশ্য হলো মহান সাধু যোসেফের প্রতি আমাদের ভালবাসা বৃদ্ধি করা, তাঁর মধ্যস্থতায় অনুনয় প্রার্থনা করা এবং পুণ্য ও সদ্গুণাবলী এবং উৎসাহী মনোভাবকে অনুসরণ করা। সাধু সাধ্বীগণের মূল প্রেরণকাজ শুধু আমাদের জন্য আশ্চর্য কাজ ও অনুগ্রহ দান করা নয়, বরং ঈশ্বরের কাছে আমাদের জন্য অনুনয় প্রার্থনা করা।

পবিত্র ও পরিপূর্ণ জীবন অর্জনে সাধনা করতে সাধু সাধ্বীগণ আমাদের সাহায্য করেন। নৈমিত্তিক জীবন-যাপনকে যে মঙ্গলসমাচারীয় করে তোলা সম্ভব, সাধু-সাধ্বীগণের জীবনি আমাদের সামনে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

যিশু বলেন, "তোমরা কাঁধে তুলে নাও আমারই জোয়াল, আমারই শিষ্য হও তোমরা; কারণ আমি যে কোমল, বিনম্র হৃদয় আমি" *(মথি ১১: ২৯)*। সাধু-সাধ্বীগণের জীবনও অনুসরণযোগ্য। সাধু পল তো বলেছেনই, "আমি যেভাবে চলি, তোমরাও সেইভাবেই চল" *(১ করি ৪: ১৬)*। সরব নীরবতায় সাধু যোসেফও আমাদের একই কথা বলছেন।

সাধু যোসেফের কাছে আমরা সর্বোত্তম অনুগ্রহের জন্য অনুনয় করি: সাধু যোসেফ-আমাদের রূপান্তর করো।

পরিশেষে সাধু যোসেফ-এর বর্ষ উপলক্ষে তার মধ্যস্থতায় একটি বিশেষ প্রার্থনা রচনা করেছেন পোপ ফ্রান্সিস, যার মাধ্যমেই শেষ হয়েছে পালকীয় পত্রটি।

৮ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে কুমারী মারিয়ার অমলোদ্ভব মহাপর্ব দিনে সাধু যোহনের মন্দির হতে পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক পালকীয় পত্রটি প্রকাশিত হয়॥ (চলবে)

উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এবং রূপকল্প ২০৪১

প্রভাষক উত্তম দাস

রূপকল্প (VISION) স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যায় যে একটি পরিকল্পনা, একটি ছবি, একটি নিদর্শনা, একটি কল্পনাপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি, একটি দূরদর্শিতা, একটি ছায়ামূর্তি বা একটি মনের মধ্যে অঙ্কিত বাসনা। মানুষ তার স্বপ্নের মাঝে যেমন নিজেকে খুঁজে পেতে চায় ঠিক তেমনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জন নেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে কোথায় দেখতে চেয়েছেন তারই সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনার আর এক নাম রূপকল্প ২০৪১। অন্যকথায় বলা যায়, জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে আরও দৃঢ় করে গড়ে তোলার জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনাই হলো রূপকল্প ২০৪১।

উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বলতে সেই বাংলাদেশকে ধারণায় চিত্রায়িত হয়েছে যেখানে বাংলাদেশ হবে উন্নয়নের রোল মডেল, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের উত্তরণ যে বাংলাদেশে থাকবে না কোন বৈষম্য, কোন ক্ষুদা বা দারিদ্রতা । এক কথায় বাংলাদেশ হবে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত সেই সোনার বাংলা।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন থেকে আমরা তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নের দর্শন খুঁজে পাই। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ভাষণে আমরা দেখি তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ নির্মানে কি চমৎকার ভাবে ১৫টি দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের আর্থসামাজিক রূপরেখা সম্পর্কে বলেন, 'বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি কোনো ধর্মীয়ভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা (পরবর্তীতে সংযোজিত হয়েছিল জাতীয়তাবাদ)' । আবার ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চের ভাষণে তিনি রাষ্ট্র কাঠামোর চরিত্রের রূপরেখা উপস্থাপন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে বলেছিলেন, 'এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালী, অবাঙালী যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষর দায়িত্ব আপনাদের ওপর'- অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িক এক বাংলাদেশের চিত্র এঁকেছিলেন তিনি। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতেও আমরা দেখতে পাই- জনগণের উপর তার আস্থা ও ভালবাসার কথা। বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন-দর্শনের সারকথা ছিল সাধারণ মানুষের উন্নয়ন, কোনো গোষ্ঠী বিশেষের উন্নয়ন নয়। তাঁর দর্শনে গণমানুষের মুক্তির কথাই ছিল বারবার। সেজন্য শেষ পর্যন্ত তার হাত ধরেই জন্ম হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, যেখানে সাংবিধানিকভাবেই 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক হলো জনগন'। এ দর্শনে স্পষ্ট প্রতিফলন তার সোনার বাংলার স্বপ্ন, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন, শোষণ বঞ্চনা-দুর্দশামুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন।

আজ ২০২১ খ্রিস্টাব্দের দাঁড়িয়ে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কর্মকৌশল আমাদেরকে জানান দিচ্ছে বাংলাদেশের রূপকল্প ২০৪১। তারই গতিশীল ও দুরদর্শী নেতৃত্বে স্বল্পন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি)-এর তিন সূচক- মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ, জলবায়ু ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার পূরণ করে। ফলে এ বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি সিডিপি বাংলাদেশকে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বের হেওয় যাওয়ার সুপারিশ করেছে। সমগ্র জাতির জন্য এটা যেমন গর্বের তেমনি অহংকারের ও বটে। সেজন্য বলা যায় আজকের বাংলাদেশ বদলে যাওয়ার বাংলাদেশ। বিগত ১২ বছরের নিরলস পরিকল্পনা, পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফসল এই বদলে যাওয়া বাংলাদেশের। বর্তমান সরকার তার গৃহীত ভিশন-২০২১ থেকে শুরু করে ভিশন ২০৪১ এর মূল অনুষঙ্গ যা গত দশকের প্রশংসনীয় অগ্রগতিতে অবদান রেখেছে। যার কারণেই বলা যেতে পারে প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশই এলডিসি থেকে উত্তরণ মানদণ্ডের তিনটি সুচক একবারেই অর্জন করেছে। অবশ্য এ আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতি আমাদের দেশের জন্য নুতন সুযোগ সৃষ্টি করবে।

দেশে চলমান মেগা প্রকল্পগুলি আমাদের জানান দেয় বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল কি না? **ক)** পদ্মা সেতু প্রকল্প, **খ)** রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র **গ)** কর্ণফুলি ট্যানেল ঘ) পায়রা বন্দর **ঙ)** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরী **চ)** হযরত শাহজালাল আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দরের টার্মিনাল -৩, **ছ)** মেট্রেরেল প্রকল্প ইত্যাদি। এই প্রকল্পগুলিই জানান দেয় বাংলাদেশ এ উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কতটা সক্ষম।

টেকসই উত্তরণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (8FYP) বাংলাদশে যেসব কৌশল অর্ন্তভুক্ত করেছে তা হলো- **ক)** অর্থনীতির বিকাশ ত্বরানিবত করা, **খ)** মানসম্পন্ন চাকুরী সৃষ্টি করা **গ)** দ্রুত দারিদ্র হ্রাস করা **ঘ)** সামাজিক সুরক্ষার সঙ্গে অন্তভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়া **ঙ)** জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত উন্নয়ন কৌশল, **চ)** এসডিজির লক্ষ্য অর্জন **ছ)** এলডিসি উত্তরনের প্রভাবগুলো মোকাবেলা ইত্যাদি। এ পরিকল্পনার মূল কাজ হচ্ছে এমনভাবে ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়ন করা যাতে বাংলাদেশ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা লাভ, এসডিজির বড় লক্ষ্যগুলো অর্জন এবং ২০৩০-৩১ অর্থবছরের মধ্যে চরম দারিদ্র দূর করতে পারে।

যেখানে ১৬ কোটি মানুষের প্রাণের দেশ বাংলাদেশ সেখানে সকলেই মিলে সোনার বাংলা বিনির্মানে একত্রিত হয়ে ৩২ কোটি হাতের স্পর্শে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। যে বাংলাদেশ হবে বদলে যাওয়ার বাংলাদেশ, যে বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলাদেশ॥

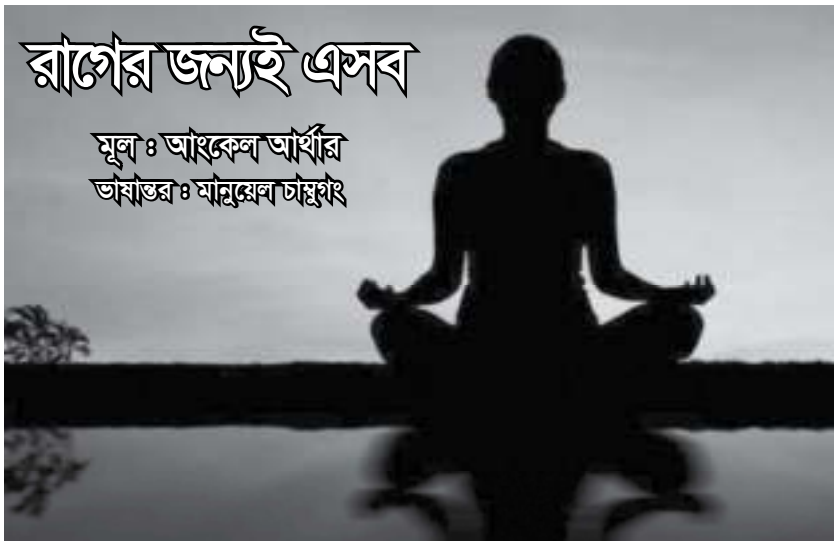

রাগের জন্যই এসব

মূল ঃ আংকেল আর্থার
ভাষান্তর ঃ মানুয়েল চাম্বুগং

খেলতে-খেলতে একসময় ট্রেভর ও জেসনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বাদে। শরীরিরের সর্বোচ্ছ শক্তি দিয়ে তারা একে অপরকে কিল ঘুষি মারে। তাদের ঝগড়া দেখে দূর দেখে এক বৃদ্ধ দৌড়ে এসে ধমকের সুরে বলল, "বন্ধ কর তোমাদের ঝগড়া, আর কখনও এভাবে ঝগড়া করবে না।" ট্রেভর ও জেসন ঝগড়া থামিয়ে বৃদ্ধ বার্ণির দিকে তাকায়। বন্ধুর মতো দুইজনকে দুইবাহুতে আঁকড়ে ধরে তাদের দিকে সে মাথা নিচু করে দেখে। এতে ট্রেভর ও জেসন আর ঝগড়া করতে পারে না। পকেটে হাত ঢুকিয়ে পরস্পরের দিকে চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে থাকে। বৃদ্ধ বার্ণি বললো, "চলো আমরা নৌকায় কিছুক্ষণ বসি; আমি তোমাদের জন্য একটি গল্প বলবো।" ট্রেভর ও জেসন বিনয়ের সহিত বৃদ্ধ বার্ণির দুইপাশে হাটে। কিছু দূর হেঁটে তিনজনেই একটি নৌকার উল্টোপিটে বসলো।

বৃদ্ধ বার্ণি গল্প বলা আরম্ভ করলো, "তোমাদের মতো ছোট থাকতে বড় ভাই ও আমি প্রায়ই চাকা-গাড়ি খেলতাম। জেসন জিজ্ঞেস করলো, " চাকা-গাড়িটা কি জিনিস?" বৃদ্ধ বার্ণি বলল, "এটি সাধারণত লোহা টুকরোর ১.৩ মিটার দিয়ে গোলাকারভাবে বানানো হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভাঙ্গা চালুনির গোলাকার অংশটি বা কাঠ দিয়ে গোলাকার করে বানিয়ে চাকা-গাড়ি হিসেবে খেলে থাকে। আর বড় ছেলেরা লোহার বানানো চাকা-গাড়ি বেশি খেলা করে। ছোট একটি শিক বা লোহা বেকিয়ে ব্রেক বানিয়ে তারা এই ধরণের গাড়ি চালায়।"

একদিন বড় ভাই ও আমি চাকা-গাড়ি খেলছিলাম। বাঁশ দিয়ে তৈরি গাড়িটা আমি খেলছিলাম। বড় ভাই খেলছিলেন লোহার গাড়িটা। তার গাড়িটা চালিয়ে দেখার জন্য আমি চাইলাম। কিন্তু সে আমাকে চালাতে দিলো না তো দিলোই না বরং বলল, "আমি নিজেই ভাল মতো চালাতে পারছি না আর তুমি তো ছোট মানুষ আরো চালাতে পারবে না।" "চালাতে পারবো দাদা, একবার শুধু আমাকে সুযোগ দাও। আমি তোমাকে দেখাবোনে কিভাবে চালাতে হয়।" "না, আমি কোনো মতেই তোমাকে দিতে পারবো না।" রাগ করে আমি বড় ভাই এর বুকে একটা ঘুষি মারি। সেও আমার মাথায় একটা ঘুষি দেয়। এভাবে আমাদের দুইজনের মধ্যে ঝগড়া চলে। একপর্যায়ে বড় ভাই আমাকে পিছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে আমি একটি পাথরের উপরে পরে হাতে আঘাত পাই। ব্যথা যন্ত্রণায় চিৎকার করে কাঁদি। বড় ভাই আমাকে উঠাতে চেষ্টা করে কিন্তু ব্যথায় আমি উঠতে পারছিলাম না। বড় ভাই ভয়ে অনুতপ্ত হয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বার-বার স্যারি ভাই স্যারি বলে আমাকে সমবেদনা জানায়।

আমার এ করুণ অবস্থা দেখে একজন পথযাত্রী দৌড়ে আমার নিকটে আসেন যে নাকি প্রাথমিক চিকিৎসা জানতেন। সে আমাকে তার কোলে নিয়ে বাড়িতে নিয়ে যায় এবং মাকে বলে তোমার ছেলের পা ভেঙ্গে গেছে ডাক্তারেরর কাছে নিতে হবে এখনি। এই কথা শুনে আমি প্রচুর কান্না করি। মাও অনেক মন খারাপ করে। তারা ডাক্তারের কাছে আমাকে নিয়ে যায়। ডাক্তার আমার জামাহাতা কেটে ভাঙ্গা হাতটি দেখে বলল, "খোকা কেঁদো না ভাল হয়ে যাবে"। এক্সরে করলে জানতে পারলাম আমার হাতের কবজি একটু নড়ে গেছে আর দুইটি হাড় ভেঙ্গেছে। ডাক্তার আমার হাতটি প্লাসটার করে দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দুইবার অস্ত্রোপচার করার পরও আমার ভাঙ্গা হাতটি আর সোজা হলো না। এই যে দেখ আমার বাম হাত ১৩ সেন্টিমিটার ডান হাত থেকে বেঁকে আছে। বৃদ্ধ বার্ণির প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে ট্রেভর বলল, "দাদু, তোমার ভাঙ্গা হাতের জন্য আমার কষ্ট লাগছে। তোমার ভাঙ্গা হাতের করুণ কাহিনী বলার জন্য অনেক ধন্যবাদ।" বার্ণি বলল, "হ্যাঁ সত্যি অনেক বছর আগে আমাদের দুইভাইয়ের মধ্যে ঝগড়ার কারণেই আমার বাম হাতটি এখন পর্যন্ত বেঁকে আছে।"

জেসন বলল, "তাহলে তুমি এর জন্যই আমাদের ঝগড়া থামিয়ে ছিলে তাই না, দাদু?" তুমি ঠিকই বলেছে দাদু, আসলে কি জানো দাদুরা, যখনই আমি দেখি কোনো ছেলেমেয়েরা ঝগড়া করছে; তখন আমার ভয় লাগে তারাও হয়তো আমার মত আঘাত পাবে। সারা জীবন কষ্ট পাবে। তাই এর জন্য ঝগড়া করা দেখলে আমি থামিয়ে দেয়। তোমাদেরকেও আজকে থামালাম। দাদুরা আজ থেকে সবসময়ই মনে রাখবে রেগে গেলে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়; কখনোই ঝগড়া করতে নেই। কারণ এতে ভাল ফল আসে না। তোমারই এখন বিচার বিশ্লেষণ করো ঝগড়া করা ভাল কাজ কি-না।

বৃদ্ধ বার্ণির কথা ঠিক। রেগে গেলে আমাদের ঝগড়া করতে নেই। কারণ তর্কে জড়িয়ে রেগে ঝগড়া করা কোনো সময়ই মানুষের জীবনে মঙ্গলকর কিছু বয়ে আনতে পারে না॥

সামাজিক রাজনীতি ও দেশীয় খ্রিস্টান সমাজ

চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু

(পূর্ব প্রকাশের পর)

গবেষকের দৃষ্টিতে স্বদেশী খ্রিস্টভক্ত :

গবেষক অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল এ.এস.এম সামছুল আরেফিন, "মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান" বইয়ে লিখেছেন, "একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে প্রায় সকল বাঙ্গালী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করলেও সাধারণভাবে হিন্দু ও মুসলমান এই সম্প্রদায়ের অংশীদারিত্বই সাধারণভাবে প্রকাশিত ও ব্যাপকভাবে পরিচিত। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে এদেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে এবং এদেশে অবস্থিত চার্চগুলো মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপকভাবে সহায়তা দান করে, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও সেবা দানের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা অতুলনীয়। এদেশে কর্মরত বিদেশী নাগরিক ফাদার মারীও, ফাদার এভেন্স, সিস্টার ইম্মানুয়েল এবং এদেশের সন্তান লুকাস মারান্ডি মুক্তিযুদ্ধে আত্মদান করেন। মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ষাটোর্ধ্ব সিস্টার ইম্মানুয়েলের দেহকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে উড়িয়ে দেয়া হয়। যোয়াকিম গোমেজসহ বহু খ্রিস্টানকে ধরে নিয়ে তাদের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালানো হয়। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের যুবকরা দেশব্যাপী উপজাতি সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন ছোট ছোট গেরিলা দল। ময়মনসিংহে গারো খ্রিস্টানদের ১২০০ জনের দল গঠন, দিনাজপুর জেলায় উড়াও ও সাঁওতালরা গঠন করে ১০০০জনকে নিয়ে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সুনামগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, জলিলপাড়, জলছত্র, হালুয়াঘাট রাণীখং, হাসনাবাদ, মরিয়মনগর, সাভার, কালিগঞ্জের রাঙ্গামাটিয়া, তুমিলিয়া, নাগরী প্রভৃতি স্থানে ছোট ছোট দল নিয়ে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের তরুণরা দেশকে মুক্ত করার জন্য সারাক্ষণ যুদ্ধ করে। এছাড়া গোটা দেশের অন্যান্য স্থানে দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গেও এঁরা একত্র হয়ে যুদ্ধে অংশ নেন" *[পৃষ্ঠা নং-৫০৪]*।

মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় আমরা :

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারীতে ত্রৈলক্ষনাথ চক্রবর্তীর লেখা, "জেলে তেত্রিশ বছর" পাকিস্তান সরকারের বাজেয়াপ্ত করা বইটি পড়ার সুবাদে, একজন ত্যাগীপুরুষ ও দেশ প্রেমিকের কঠিন পরীক্ষাপূর্ণ জীবনীটি পাঠকরে আমি শেষ করেছিলাম। বইটি আমাকে মুক্তিযুদ্ধের ত্যাগ ও বিনাবাক্যে নেতার নির্দেশ মেনে চলার জন্য আমার জীবনে দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিলো বিধায়, আগরতলায়

পৌছেই প্রথমে ছাত্র নেতাদের খুঁজে বের করলাম। কলেজ টিলায় আবদুল কুদ্দুস মাখনকে না পেয়ে তাঁর দরজায় একটি চিরকুট রেখে শ্রীধর ভিলায় গিয়ে পেলাম আ.স.ম. আবদুর রবকে। রব ভাই কয়েকটি বাক্যে এফ.এফ. ও বি.এল.এফ সম্পর্কে আমাকে ব্যাখ্যা করে বিশ্বাসী, সাহসী, সুস্বাস্থ্যবান এবং শিক্ষিত যুবকদের বাছাই করে বি এল এফ এ পাঠানোর পরামর্শ দেন। পূর্বাঞ্চল প্রধান শেখ ফজলুল হক মনি ভাইর সাথে কাজের মধ্য দিয়েই পরিচিতি হলাম। অতপর, যুদ্ধের পরিস্থিতি পরিদর্শনে যাবার পথে প্রথমে মনি ভাই আমাকে একদিন বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে নিয়ে যান। পরে কখনো রব ভাই, কখনো শাজাহান সিরাজ, কখনো স্বপন কুমার চৌধুরীদের সাথে বেশ অনেকবার মাতৃভূমির পবিত্র মাটি কপালে ছুঁয়ে ধন্য হয়েছি। একজন স্বল্প ভাষী কর্মী হিসেবে, মনিভাই আমাকে পছন্দ করতেন এবংমানসিক চাপ থেকে কিছুটা হালকা হতেই হয়তো, তিনি যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আমাকে ছোট খাটো বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করতেন।

বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (বি,এল,এ-ফ)কে মুজিব বাহিনী বলা হতো। কারণ ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের ত্যাগী ও বিশ্বস্থ কর্মীরাই কেবল এখানে প্রশিক্ষণ লাভ করার সুযোগ লাভ করেছেন। এ বাহিনীতে অস্ত্র পরিচালনার সাথে কিছুটা রাজনীতি এবং প্রশাসনিক বিষয় দীক্ষা দেয়া হতো। আমাকে খ্রিস্টান যুবকদের নির্বাচন করার দায়িত্ব দিলেও মাঝে মাঝে দু'একজন করে, খ্রিস্টানদের সাথে হিন্দু ও মুসলমান ছেলেকে মুজিব বাহিনীতে প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ করে দেয়ায়, সবার মাঝে আমার বেশ জনপ্রিয়তা ও গ্রহণ যোগ্যতা গড়ে উঠেছিলো। ঢাকা জেলার মুজিব বাহিনী কার্যালয়টি ছিলো অরুন্ধতি নগরের পাশে, বেলতলি এলাকার দারোগা বাবু মজুমদারের বাড়ীর ভাড়াটে বাসস্থানে। গোটা জেলার যুদ্ধ পরিস্থিতি, অবস্থান ও জরুরী দপ্তরের গোপন বিষয়গুলো বেতার যন্ত্রে আমাকে জানানো হতো। ঢাকা জেলা বি.এল.এফ শিবির পরিচালনার ভার আমাকে দেওয়ায় বুভুক্ষা, আহত যোদ্ধাদের রান্নাকরা নিজেদের খাবার খাইয়ে প্রায়ই নিজেকে না খেয়ে কাটাতে হয়েছিলো বিধায়,রক্ত আমাশয়ে আক্রান্ত হয়ে আমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছিলো। দুর্বল শরীর নিয়ে অজানা অচেনা মানুষের সাথে বিভিন্ন তাবু

পরিদর্শন করে পরিচিতদের সমস্যায় আমাকে বিভিন্নমুখী সাহায্য করতে হয়েছে। নির্ধারিত দলের সাথে নয়, বরং দু'চারজন নেতাকে নিয়ে কখনো দু'দিন, কখনো তিনদিন, এভাবে চারবারে প্রায় পনের দিন আমাকে ভারতীয় সেনা বাহিনীর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের হাতে অস্ত্র পরিচালনার প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছে। মেলাঘর, উদয়পুর, হাফলং ক্যাম্পে বেশ কয়েকবার রাত কাটিয়ে ছাত্র নেতাদের সাথে আমাকে স্বসস্ত্র যুদ্ধের কৌশলাদি শেখানো হয়েছিলো। ত্রিপুরা রাজ্যের গভর্ণর এ,এল,ডায়েস ও মরিয়ম নগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ব্রাদার ছিপ্রিয়ান রিচিলের সহযোগিতা এবং পূর্বাঞ্চলের সেনাপ্রধান কর্ণেল বি,কে,কোড়ায়ার সহযোগিতায় নভেম্বর মাসে আমার মাধ্যমে দুইশত মুক্তিযোদ্ধাকে স্বশস্ত্র করা হয়েছিলো।

পরদেশে মানব সেবা :

আগরতলা উপশহর এলাকায় কাশিনাথপুর অবস্থিত। বাস থেকে নেমে আধাপাকা সড়ক ধরে মাইল দেড়েক হাটার পর মরিয়ম নগর ক্যাথলিক ধর্মপল্লী। পাল পুরোহিত কেনাডিয়ান ফাদার জর্জ লেকলিয়ার সিএসসির উদারতার কারণে আমাদের থাকার উদ্দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কক্ষগুলোতে রাতে ঘুমাবার উদ্দেশ্যে একটি যুব শিবির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো। অল্প দিনের মধ্যেই মরিয়ম নগরে "কারিতাস ইন্ডিয়া"র একটি ছাত্র-যুব সেবাদলের আগমন ঘটে। ফাদার জর্জের মাধ্যমে ওরা আমার কাছ থেকে কয়েকজন স্বেচ্ছা সেবক চাইলে, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং খ্রিস্টান ছাত্র কল্যাণ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক বেনেডিক্ট ডায়েস, মনু বেনেডিক্ট ডি'ক্রুজ, মনিন্দ্র চন্দ্র মন্ডল, সুবাস আব্রাহাম ডি' কস্তা ও আন্তনী কোড়াইয়াকে সাহায্য সংস্থার কাজে নিয়োগ দেওয়ালাম। এদের যাতায়াতের উদ্দেশে একটি জীপ দেয়া হলো এবং হাত খরচ বাবদ মাসে একশো পঁচিশ টাকা করে দেয়া হতো। ভারতীয় কারিতাস একজন ডাক্তার খুঁজছিলেন। দুদিন পরেই ডাঃ বার্ণাড ডি'রোজারিও (এলএমএফ) স্বপরিবারে আমাদের শিবিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ফাদার জর্জকে বলে ডাক্তার বার্নাডের স্ত্রী লীনা গমেজকে নার্স এবং তার কম্পাউন্ডার ফনিন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তীসহ ডাক্তার বার্ণাডকে ক্যাম্পের চিকিৎসার কাজে লাগিয়ে দেয়া হলো। ডাক্তার বার্ণাডের জীপ চালানোর জন্য স্থানীয় খ্রিস্টান চালক রবার্ট ডি'ক্রুজকে নিয়োগ দেয়া হলো। ড্রাইভার সাহেবের খাম খেয়ালির জন্য একবার দুর্ঘটনায় পাহাড়ি রাস্তা থেকে পড়ে গিয়ে পরিবারের সবাইকে আহতাবস্থায় যখম হয়ে হাসপাতালে আশ্রয় নিতে হয়েছে। কুঞ্জবন সরকারী হাসপাতালে তাদের দেখতে গিয়ে গোল্লা ধর্মপল্লীর চিকিৎসাধীন ইঞ্জিনিয়ার আগষ্টিন রিবেরুকে পেলাম। সিলেটে পাক-বাহিনীর ব্রাশ ফায়ারে, তার দুইপাই ভেঙ্গে গিয়েছিলো। তিনি পাপ স্বীকার-কম্যুনিয়ন চাইলে ফাদার জর্জকে পাঠিয়ে আহত ইঞ্জিনিয়ার আগাষ্টিনদাকে মনোবল বৃদ্ধি ও আত্মশক্তি সঞ্চয়ে সহযোগিতা করা হয়েছিলো।

ছড়িয়ে পড়া শত্রুদের প্রতিরোধ :

বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি গ্রাম যখন গেরিলাযুদ্ধে আন্দোলিত, প্রতিশোধের হীন আক্রোশ বশত: আতঙ্কিত পাকবাহিনী অতর্কিত হামলায় বাংলাদেশের যত্রতত্র আক্রমণ করে সন্ত্রাসের রাজত্বে পরিণত করে তোলে। যোদ্ধাহত গ্রাম বাংলার তথ্য বিবিসি ভয়েস অব আমেরিকা, আকাশ বাণী ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বিশ্বসমাজের কাছে প্রচার করে বিপন্ন বাংলাদেশের সংবাদ প্রচার করা হতো। প্রাণভয়ে আতঙ্কিত নীরিহ মানুষ নিজ দেশের সংবাদ জানার জন্য তীর্থের কাকের মতো বেতার বার্তা শোনার অপেক্ষায় চব্বিশ ঘন্টা সম্ভাব্য নিরাপদ এলাকায় অপেক্ষায় থাকতেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এম,আর, আখতার মুকুলের ব্যাঙ্গাক্তপূর্ণ যুদ্ধের ঘটনা শোনার অপেক্ষায় সারা বাংলার মানুষ খন্ড খন্ড দলে জড়ো হয়ে বসে থাকতেন।

কৃষক, শ্রমিক, মেহেনতি মানুষের ছদ্মবেশী বিচ্ছু মুক্তিযোদ্ধাদের আচমকা আক্রমণের সংবাদ তখন বিশাল বিজয়ের আনন্দে সাধারণ মানুষকে পুলকিত করেছে। পথে, ঘাটে, মাঠে সর্বত্র দলবদ্ধ মানুষ স্বাধীনতার নামে আশার আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে দুইএকজন পাঞ্জাবী সৈন্যের মৃত্যুই যেন বাঙ্গালির মনে এ্যাটম বোমার বারুদের গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে। তথাকথিত ধর্মীয় সংখ্যালঘু খ্রিস্টান বসতিস্থানগুলো, অতীতে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হলেও ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধের দামামা সকল বাঙ্গালি, তথা সীমান্ত এলাকার আদিবাসী খ্রিস্টান ধর্মপল্লীগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ছিলো সম্পূর্ণ শূণ্য। পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকা অতিক্রম করে সর্বহারা আদিবাসী ও বাঙ্গালিরা ভারতে প্রবেশ করত: বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করে প্রাণে বেঁচে গেলেও দীর্ঘ নয় মাস তারা শূণ্য হাতে খেয়ে না খেয়ে আত্মরক্ষা করেছেন। এক কোটি মানুষ ভারত সরকারের করুণায় দীর্ঘ নয় মাস পরভূমিতে আশ্রিত জীবন অতিবাহিত করেন।

মানবিক কারণে শরণার্থীদের সেবায় বিভন্ন সরকারী-বেসরকারী সংস্থা সর্বহারা মানুষের প্রতি সেবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। স্বনামধন্যা মাদার তেরেসাসহ খ্রিস্টান মিশনারীদের সেবাদান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালিন ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতরণ করেছে। দেশের অভ্যন্তরে সৎসাহসী সাধু পুরুষ স্বর্গীয় আর্চবিশপ টিওটনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি'র নির্দেশে যোদ্ধাহত বাংলাদেশের প্রতিটি ধর্মপল্লী নিরীহ হিন্দু ও গৃহহারা খ্রিস্টান জনতার আশ্রয় শিবিরে পরিণত হয়েছিলো। এমতাবস্থায় তথাকথিত অরাজনৈতিক খ্রিস্টান পল্লীতে জনশূণ্যতার কারণে পাকিস্তান বাহিনীর সদস্যরা অবাধে লুটপাট করে পেট পুজা দিতে গৃহপালিত পশু ছিনিয়ে নিয়েছে। বিশেষতঃ ঢাকার অদূরে পূবাইল- আরিখোলার রেল সড়কের দু'ধারে অবস্থিত খ্রিস্টান-হিন্দু-মুসলমানদের বেশ কয়কটি গ্রাম জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দিয়েছিলো। নল্‌ছাটা, লুদুরিয়া ধনুন, দড়িপাড়া, বান্দাখোলা, তুমিলিয়া এবং সর্বশেষ পর্যায়ে এসে রাঙ্গামাটিয়া গ্রামটি তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। জনশূণ্য গ্রামগুলোতে লুট করতে আসা সেনাসদস্যরা, নিজগৃহ পাহারায় থাকা মানুষদের মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে অযথা গুলি করে হত্যা করেছে। যুদ্ধের প্রথমার্ধে অরাজনৈতিক খ্রিস্টভক্তদের গলায় ক্রুশ অথবা রোজারী মালা (তজ্‌বী) সাথে থাকায় তাৎক্ষণিকভাবে বেঁচে গেলেও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় সবারই গলায় অহরহ ক্রুশ পাওয়া গেলে, গোটা দেশের খ্রিস্টান ভক্তগণও নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েন। শেষ অবধি খ্রিস্টান যুবকরা বাধ্য হয়েই দলে দলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

অতঃপর, লালমনিরহাট ব্যাপ্টিস্ট মিশন এলাকায় লুটপাট, ধর্ষণ, হত্যা এবং অগ্নি সংযোগ করা হয়। নাটোরের বনপাড়া খ্রিস্টান পল্লীতে ইটালিয়ান ফাদার অ্যাঞ্জেলো ক্যানটনের আশ্রয়ে থাকা হিন্দু

শরণার্থীদের তোলে অন্যত্র নিয়ে হত্যা করা হয়। পাবনার চাটমোহর এলাকার মূলাডুলি, ময়নার মাঠ, মথুরাপুর ধর্মপল্লী, রাজশাহীর রুহিয়ার শাওতাল এলাকা, খুলনার মংলা এলাকা, দিনাজপুর শহরে বাঙ্গালি-আদিবাসী এলাকা, বরিশালের পাদ্রিশিবপুর, নারিকেল বাড়ী, ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট, বালুচড়া, বিড়িশিড়ি, টাঙ্গাইলের জলছত্রে কাদির বাহিনীর গারো সদস্যদের স্বশস্ত্র যুদ্ধ করেও মুক্তিযোদ্ধাদের সরকারী তালিকায় ৯৫% ভাগই নাম লিপিবদ্ধ হয়নি। চট্টগ্রাম শহরের অভ্যন্তরে এবং বিভিন্ন গ্রামে অ্যাংলো বাঙ্গালি খ্রিস্টভক্তদের অবদান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রচনার পিছনে ছিলেন বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি, সেন্ট স্কলাস্টিকাস গার্লস্ স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সিষ্টার জীতা মড্ রিবেরু আরএনডিএম যিনি যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পৌঁছলে, জেনারেল যাকব অরোরা পর্যন্ত সম্পর্ক রক্ষা করে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন। বুদ্ধিজীবি হত্যা তালিকায় তাঁর নাম থাকায়, সরকারের আহ্বানে সভাস্থলে তিনি উপস্থিত হলে, পাকিস্তানী খ্রিস্টান মেজর তাঁকে বাধা প্রদান করেন বেং "কনভেন্টে" ফেরত পাঠিয়ে সেদিন প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন।

২৬ নভেম্বর রাঙ্গামাটিয়ার যুদ্ধঃ

রাঙ্গামাটিয়া থেকে শিক্ষিত এবং সাহসী বিএলএফ বাহিনীর বেশ কয়েকজনের নেতৃত্বে গ্রামটিকে মুক্তিবাহিনীর প্রকাশ্য ঘাটিতে পরিণত করা হয়েছিলো। পাঞ্জাবীদের যাতায়াতে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে ২৫ নভেম্বর, বান্দাখোলা - দড়িপাড়ার সংযোগস্থল, আশ্করের বাড়ীর পশ্চিমে দড়িপাড়া রেলসড়কের পুলটি ভেঙ্গে দেবার বুদ্ধিতে এলাকাবাসী কোদাল নিয়ে সড়ক কাটতে আরম্ভ করলে, মিলিটারী ভর্তি একটি ট্রেন এসে এলোপাথারি গুলি বর্ষণ করে। সেদিনের আক্রমনে গ্রামের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছিলেন। পরের দিন ২৬ নভেম্বর, একই সময় ধরে পূর্বাইল থেকে কামান দাগিয়ে পাক সেনারা রাঙ্গামাটিয়ায় আক্রমণ চালায়। পাক সেনারা পূর্বদিক থেকে বিশাল বাহিনী নিয়ে পায়ে হেঁটে গির্জায় গিয়ে পৌঁছে। মার্কিন যাজক ফাদার চার্লস হাউজার সিএসসি পালিয়ে পাটক্ষেতে আশ্রয় নেন। পাকিস্তানীরা পুরোহিতকে না পেয়ে সমবায় ঋণ দান সমিতির নথিপত্র তছনছ করে এবং গির্জায় আঘাত করে গ্রামে ঢুকে পড়ে। গ্রামের মানুষ স্নানাহারে ব্যস্ত এমন সময় মাত্র ২৫-২৬ জন মুক্তিযোদ্ধা কামানের বিরুদ্ধে এলএমজি চালালে গ্রামটির উপর বিমান বাহিনীর আক্রমন আরম্ভ হয়।

সেদিনের যুদ্ধে রাঙ্গামাটিয়া গ্রামে ১৩৭টি বাড়ী অগ্নিদগ্ধ করা হয়। যুদ্ধশেষে জানা যায় মোট ১৭জন নিহত এবং ১৪জন আহত হলেন। দুপুরে গ্রামবাসীরা স্নানাহারের প্রস্তুতি নেবার সময়, পাকবাহিনীর আক্রমনে কয়েক ঘন্টার মধ্যে গ্রামটি পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেলো। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে রাঙ্গামাটিয়া খ্রিস্টান পল্লীটি হয়ে উঠলো ঐতিহাসিক পটভূমিকার এক উল্লেখযোগ্য ঘটনাস্থল।

পাকিস্তানীদের আত্মসমর্পন ও বিজয়ানন্দ :

দীর্ঘ নয়মাস অবধি মুক্তিপাগল বাঙ্গালির গেরিলা হামলা ও খন্ড যুদ্ধ শেষে, মিত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ আক্রমন আরম্ভ হলে ৪ ডিসেম্বর, ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৬ ডিসেম্বর, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করেন। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পরাশক্তি পাকিস্তানী বাহিনীর উপর মুক্তিবাহিনীর সাথে মিত্রবাহিনী প্রতিরক্ষামূলক ত্যাজদীপ্ত যুদ্ধ চালিয়ে যায়। ইতিমধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং তাজউদ্দিন আহমদ যশোরে স্বক্রিয় যুদ্ধে অবস্থান নেন। ভারতের চীপ অব্ স্টাফ জেনারেল মানেক শ'পূর্ব রণাঙ্গণে যুদ্ধারত পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পনের আহ্বান জানান।

১০ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর সমন্বয়ে যৌথ কমাণ্ডকে মিত্র বাহিনী নামে ঘোষণা ও প্রচার করা হয়। ১৩ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকাকে, চতুর্দিক থেকে ঘিরে অবরুদ্ধ রেখে পাকিস্তানকে আত্মসমর্পন করার বার্তা পাঠানো হয়। ১৫ তারিখে হানাদার বাহিনী প্রধান লে জে নিয়াজী, মানেক শ' এর কাছে আত্মসমর্পন বার্তা পাঠালে ১৬ ডিসেম্বর, বিকেল ৪টা ৩১ মিনিটে, মিত্র শক্তির কাছে ঐতিহাসিক রাজনৈতিক প্রান্তর সোরাহ্উর্দি উদ্যানে, আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পন ও দলিলে স্বাক্ষর করা হয়।

কুমিল্লা জেলার নবীনগর থানার অস্থায়ী তাবুতে অবস্থান নিয়ে, আমরা "ঢাকা জেলা মুজিব বাহিনী ও মুক্তি বাহিনী"র সদস্যরা বাংলাদেশ বেতারে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, পাকিস্তানীদের আত্মসমর্পণ বার্তা শুনে, বিজয়ের বিজয়ানন্দে আমরা সবাই মুক্তাকাশে স্বতস্ফূর্ত বুলেট নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করি। কয়েক মূহুর্তেই স্বাধীন বাংলাদেশের উল্লাসিত বাতাস বিজয়ানন্দে মাতাল হয়ে পড়ে। মহান মুক্তিযুদ্ধে আমরা ঐতিহাসিক বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে বাংলাদেশকে সেদিন সত্যি শত্রুমুক্ত করলাম এবং স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হলাম। স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রজন্ম অবহেলায় হারিয়ে যাবার কালে, সরকার মহান বীরদের সম্মান দিয়ে আমাদের ধন্য করেছেন বটে! খ্রিস্টান সমাজ নিজস্ব মুক্তিযোদ্ধাদের মূল্যায়ন করতে অদ্যাবধি ব্যর্থ। অবহেলিত, অসুস্থ এবং ভুক্তভোগীদের অভিযোগে এমনটিইশোনা যায় বটে! মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় পঞ্চাশ বর্ষপূর্তকালে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পূনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণ করে মন্ডলি নিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন সংস্থাগুরোর পক্ষ থেকে যথাযথ মর্যাদা প্রদানে এর দ্রুত সমাধান জরুরী এবং অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বলে সবাই মনে করছেন।

তথ্যসূত্র:

১। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী: "স্বাধীনতা সংগ্রামে খ্রীষ্টান সমাজের অবদান" চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু; ২ জুলাই, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ।

২। দৈনিক জনকণ্ঠ: "পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ" মোস্তাফিজুর রহমান টিটু: ১৯ মার্চ, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।

৩। দৈনিক সংবাদ: "আজই সেই ১৯ মার্চ; গাজীপুরে সংগঠিত হয়েছিলো এদিন প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ" মুকুল কুমার মল্লিক: ১৯ মার্চ, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।

৪। বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলী: যেরোম ডি' কস্তা: প্রকাশকাল: আগস্ট, ১৯৮৮ প্রতিবেশী প্রকাশনী, ৬১/১, সুবাস বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা।

৫। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান: এএসএম সামছুল আরেফিন, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১১৪, মতিঝিল বা/এ, পোষ্ট বক্স-২৬১১, ঢাকা-১০০০।

(সমাপ্ত)

যাওয়া

রবার্ট চিরান

'শেষ পর্যন্ত কি চাকুরীতে যোগদান করছো?' - জিজ্ঞেস করে অলক।
নীতা একটু খাপছাড়া বিরক্তির সুরে উত্তর দেয়-
- নয় তো কি !
- ও আচ্ছা! কতক্ষণ চুপ থেকে আবার অলক শুধোয়-
- তুমি থাকবে কোথায়? বাসা ঠিক করেছ?
পূর্বের চেয়ে আরো একটু তার সুরে নীতা উত্তর দেয়-
- ঠিক করিনি। তবে ঠিক হয়ে আছে।
- হয়ে আছে মানে! অলক একটু আশ্চর্য হয়।
- মানে হলো- যে অফিসের চাকুরী করবো সেই অফিসেই থাকা খাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- তাই! কিন্তু সেখানে তুমি একা থাকবে? উদ্বিগ্নের সাথে অলক প্রশ্ন করে। নীতা তার প্রতিউত্তরে জবাব দেয়-
- তাই বৈকি!
- সে আবার কেমন কথা! এ যে বিলক্ষণ নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনা! এরকম তো কথা ছিল না। চাকুরী দাতা তো এ রকম কিছু আগে বলেনি! তুমিও তো আমাকে সে রকম কিছু বলোনি!
- কেন? আমি কি একা থাকতে পারবো না। আর একা থাকা কী অন্যায় কিছু?
- নাহ! অন্যায় হবে কেন? কিন্তু তোমার একটা বংশ মর্যাদা আছে, আত্মমর্যাদার ও ব্যক্তিত্বেরও ব্যাপার আছে নাকি?
- সেই বংশ মর্যাদা আমাকে ভাত দেয় নাকি কাপড় দেয়? আমার চাই টাকা টাকা বুঝেছ কিছু?
- আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের ব্যাপারটা শুধু ব্যক্তিরই ব্যাপার বটে!

অলক আর কথা বাড়ায় না। নীতার কথা-বার্তা শুনে তার কোন কথা মুখ দিয়ে বের হল না। না হওয়ারই কথা। কারণ, এ যে রীতিমতো পুরুষ নির্যাতন! এতদিন সে শুনে এসেছে নারী নির্যাতনের কথা যা পুরুষ কর্তৃক করা হয়। কিন্তু আজ তার ভুল ভেঙ্গেছে। সমাজে পুরুষ নির্যাতনও হয়। বস্তুত অলক চেয়েছিল সংসার জীবনে তাদের একটা সুখী-সমৃদ্ধ পরিবার হবে। পরস্পরের সব বিষয়ে শেয়ার হবে, প্রত্যেকের অংশগ্রহণ থাকবে, যেখানে উভয়ের ভাল বোঝাপড়া থাকবে আর সর্বোপরি থাকবে পরিবারে শান্তির পরশ। কিন্তু বাস্তবতা বিপরীত ফল নিয়ে হাজির। সংসার আর কতদিনেরই বা তারা করেছে? মাত্র তো তিনটি বছর হলো। এরই মধ্যে সব সুখ হাওয়া হয়ে গেল? সুখ কি টাকা দিয়ে কেনা যায় তাহলে? মনে-মনে প্রশ্ন করে অলক। তার প্রশ্নের উত্তর সে আর খুঁজে পায় না। অগত্যা সে পূর্বের যে কাজ সেই লেখালেখিতেই মনোযাগটা বাড়িয়ে দিল। জানে এখন তর্ক করে কোন লাভ নেই। সময় অপচয় আর মানসিক কষ্ট পাওয়া ছাড়া কিছুই সেখানে পাওয়া যাবে না। অন্যদিকে নীতা তার সেই দাম্ভিকতা বজায় রেখে নিজেকে আয়নার সামনে সাজানোর বদ্ধ প্রয়াস পাচ্ছে।

এখন প্রায় বিকেল ৪টা। অনেক ক্ষেত্রে সে পুরনো অভ্যেসটার চর্চা করতে প্রয়াস পেলেও তা আর হয়ে উঠে না। পারিপার্শ্বিক সময় বা পরিবেশ যে সেরকম আর নেই। বর্তমান ডিজিটাল যুগে এসে সে যেন খেঁই হারিয়ে ফেলছে। বর্তমানের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে বা তার সাথে তাল মিলাতে পারছে না। কোথাও যেন ভুল হচ্ছে তার। সে অনেক ক্ষণ তার গল্পের প্লট হাতড়িয়েও কোথাও কোন সময়োপোযোগী প্লট খুঁজে পেলে না। মিছামিছি কাগজে আঁকিজুঁকি করল। রেখা টানল, মানুষ, গরু, গাছ, ঘর-বাড়ী, নদী, নৌকা, গাঁয়ের দৃশ্য আঁকল। আবার কাঁটল, আবার শুরু করল। কিন্তু কিছুই হল না। বরং তার মানসিকতায় একটা চিন্তার ভাঁজ দেখা গেল। কতক্ষণ বাইরে বিকেলের করোজ্বল আর তার প্রতিফলিত আবেগময় অথচ নিরানন্দতায় ভরা বিকেলের দুরের সেই যে রেখা দিগন্তের প্রান্ত স্পর্শ করেছে, তা অলককে আকর্ষণ করতে পারল না। সেই দিগন্ত রেখা, যে আকাশ স্পর্শ করেছে, সেখানে আকাশ ও দিগন্তের একটা অদৃশ্য মিলনদৃশ্য প্রকৃতিকে দিয়েছে আর এক মাত্রা। সেখানে কারোর প্রবেশাধিকার নেই, দ্বিতীয় কোন অস্তিত্বেরও বালাই নেই; একমাত্র অলক ছাড়া। জয়-পরাজয়ের কোন দৌড় নেই। পরাজিত হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই, নেই কোন বেদনার লেশমাত্র। কষ্টাকষ্টের বিষয় নেই। সেখানে শুধু অনাস্বাদিত সুখ আর সুখ। কি অপরূপ সেই দৃশ্য! অলক এক মুহূর্তে নিজেকে সেখানে হারিয়ে ফেলল।

এদিকে নীতা তার কাজ সেরে তার টেবিলের কাছে এসে হঠাৎ করেই তাকে আর্শ্চয করে বললে, এই! দেখেতো আমি কেমন সেজেছি?
অলক নীতার এই অদ্ভুত প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে বিমূঢ় হয়ে নীতার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। অলক দেখল যে, নীলাম্বরী শাড়ীতে বেশ ভালই মানিয়েছে নীতাকে। বহুদিন যাবৎ নীতাকে সে এই বেশে দেখেনি। আর সেই সুযোগও বা কোথায়? সেই চিরাচরিত পরিবেশগত অভাব, মন-মাসসিকতা আর হাল-চাল তাতে তাল মিলাতে গিয়ে অলকেরও সেই চিন্তা করার বা নীতারও সেখানে মনোযোগ দেয়ার ফুরসত কোথায়? তার মানে বর্তমান ডিজিটাল যুগে যা করা হয় না, যা বর্তমানে বেমানান, সেই বিষয়টার সাথে তাল মিলায়েই তা করেছে নীতা। এতদিন নীতা শুধুই সালোয়ার-কামিজ পড়েছে, ভুলেও কোনদিন শাড়ী পড়েনি। সেই যে বিয়ের সময় একবার লালচে খয়েরী শাড়ীটা সে পড়েছিল; সেই থেকে সে আর শাড়ী পড়েনি। গ্রামের সেই চিরাচরিত সাজ যা আসলেও আধুনিক ডিজিটাল সমাজে বেশ বেমানান। আধুনিকার বদৌলতে সেই অকৃত্রিম সংস্কৃতির ছোঁয়া হারিয়ে গেছে কবে মন থেকে। অলক যতবার নীতাকে সেই কথা বোঝাতে চেয়েছে, ততবারই নীতা সেই বিষয়টা এড়িয়ে গেছে। কিংবা গুরুত্ব দেয়নি। এই নিয়ে তাদের মধ্যে মাঝে-মাঝে বাক্‌যুদ্ধ হয়েছে। হার অলককেই মানতে হয়েছে। নীতার রুচিবোধে কোনদিন হাত দেয়নি বা জোর করে তার লালন করা বিশ্বাসটা নীতার উপর চাপিয়ে দিতে কখনও চেষ্টা করেনি। সংসারের হাল ধরতে গিয়েও অলক সমঝোতার পথ বেঁছে নিয়েছে। সংসারকে সহজ পথে পরিচালিত করতে কত কিছুই তো মনুষকে ছাড় দিতে হয়। নিজের আশা-আকাঙ্খা, চাওয়া-পাওয়া কত কিছুই তাদের জীবনের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে তাদের গভীর সংস্কৃতির শিকর থেকে। নীতার নিজস্ব রুচিবোধ বা একান্ত বিশ্বাসে বা যুগের হাওয়ার সাথে তাল মিলাতে নীতার ব্যক্তিত্বকে প্রাধান্য দিয়েছে। তাই সংসারে কোনদিন কোন বিষয়ের উপর তাদের মাঝে অবিশ্বাসের জন্ম হয়নি। আত্ম-মর্যাদাবোধেও আঘাত আসেনি। কিন্তু তাদের সংসারে একটু আধটু অর্থনৈতিক সংকট গাঢ় থেকে গাঢ় হয়ে উঠছিল। মাঝখানে তাদের জীবনে একটি ঘটনা যা খুবই কষ্টদায়ক ব্যাপার ঘটে গেছে। যা তাদের সংসার জীবনে অন্ধকারের ছায়া ফেলেছে। তিন বছরে যে সুখ, যে শান্তিময় জীবন তাদের ছিল, সেই সব দিনের জন্য তাদের কোন আফসোস না থাকলেও আজ সেইসব দিনগুলিই ফিরে এসেছে অভিশপ্ত হয়ে। বস্তুত: তিন বছরে কোন সন্তান তাদের জীবনে আসেনি। বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেও তাদের ফল শুণ্যই থেকে গিয়েছে। সেই সব শুণ্য হাহাকার ব্যাপারগুলো বোধহয় তাদের সেই বিবাহিত জীবনের সেই সব সুখগুলো কেড়ে নিয়েছে। নীতার বিবাহিত জীবনের সমস্ত সুখ কেড়ে নিয়েছে। বস্তুত: তাদের বিষয়টা একই এবং উভয়ই একই কষ্টের সমব্যথী।
নীতা তার প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে আবার তাকে তাগাদা দিলে, কই কিছুই তো বললে না।
সেই মুহূর্তে অলক হাসবে নাকি কাঁদবে তার কোন জুটসই উত্তর খুঁজে না পেয়ে মুচকি হাসি নিয়ে অপলক চেয়ে থাকল নীতার তোল খাওয়া গালের উপর। আর মনে একটা ছোট্ট দুষ্টুমীর ঢেউ খেলে যাচ্ছে তা বিলক্ষণ অলক বুঝতে পারছে। কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারল না। এ যেন অল্প সুখে কাতর অধিক সুখে পাথরের মতো দশা। অলক জানে যে নীতার কোথায় কোথায় দুর্বলতা আর কখন তার মনটা প্রসন্ন থাকে। এই মুহূর্তে তাকে চটিয়ে দেয়াটা তার জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে না ভেবে সে নীতার এমন আচরণের কোন অভদ্রসুলভ প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে নিরবেই তার পরনের সাজ দেখে পুলক অনুভব করল আর এক হেচ্‌কা টানে

নীতাকে তার দিকে টেনে নিলে নিজেরে কাছে আর আদর-সোহাগে তাকে ভরিয়ে দিলে। অর্থাৎ পরিস্থিতিকে সামাল দেয়ার জন্য যা করা দরকার সেই রকম! এবং বললো-

- তুমি যদি চাকরী করতে চলে যাও, তাহলে আমি একা এখানে কি করবো বলো?
- কেন? তুমি দিনে একটা করে চিঠি দিবে!
- এখন কি আর সেই দিন আছে যে তোমাকে চিঠি লিখব?
- ও তাইতো! এখন যে ডিজিটাল যুগ চলছে! তাহলে তো আরো ভালই হলো যে তোমাকে প্রতি মুহূর্তে দেখতে পাবো। কি বলো?
-তুমি একা থাকতে পারবে তো!
-আলবৎ পারবো।
- কিন্তু আমি একা থাকতে পারবো না।
-আজকাল কি যোগাযোগের কোন সমস্যা আছে? তোমার এনড্রইড মোবাইল তাহলে কেন রয়েছে?
- তা আছে বটে! কিন্তু সেটা দিয়ে কী -----
- এ নিয়ে কোন চিন্তা কর না তুমি। আমি ব্যবস্থা করবক্ষণ!
- তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?
- এটা নিয়ে তুমি ভেবনাতো!
-হ্যাঁ। তুমি ব্যবস্থা করবে বৈকি। এভাবে সংসার চলে?
-চালাতে হবে, চালাতে হয় বুঝেছ?
-হুম্!
-তাহলে তুমি আমার মতে একমত হয়েছো?

অলক এর কোন উত্তর দিলে না। চুপচাপ জানালার অপাশে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা যেখানে বেশ খেলায় মেটে উঠেছে-সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে দীর্ঘ নিস্বাস ফেলল অনিতার অজান্তে। অনিতা তা টেরও পেলে না। দু'জনই চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে থাকল। এরপর বেশ অনেকক্ষণ কেটে গেছে। অলক প্রায় বিষয়টি ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু অনিতা সেই চাকুরী স্থলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার বিষয়ে আবার স্মরণ করিয়ে দিলে। অলকের আশঙ্কা- আবার সেই একই কাহিনী হবে নাতো! অলকের মনে সন্দেহ আর দ্বিধা যেন আর কাটতে চাইছে না। কিন্তু নীতা যে নাছোড়বান্দা! উপায়ন্তর না দেখে অলক নীতার চাকুরীতে যাওয়ার বিষয় নিয়ে কোন কথা বললও না আবার নাও করল না। একদিকে তার প্রেস্টিজের ব্যাপার অন্যদিকে নীতার জেদ আর সমাজ। ক্যালেংকারী আর অনিশ্চিত ভবিষ্যত তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। বিষন্নতায় ভরে গেল তার মনটা। কোন কিছুতেই তার মন বসল না। কোন কাজও করলে না আবার অনিতাকেও তার মনের কথাটা বলতে পারলে না। শুধু অপেক্ষায় অপেক্ষায় মনটা তার ভার ভার মনে হলো। অগত্যা অলককে ছাড় দিতে হচ্ছে অনিতাকে। কারণ, তাকে ধরে রাখার মতো এই মুহূর্তে অলকের হাতে কোন অস্ত্র নেই বা সেই অবস্থায়ই নেই।

মনের সাথে অনেক যুদ্ধ করে অলক ঘর থেকে বের হলে। এক হাতে অনিতার ব্যাগ আর অন্য হাতে সেই এন্ড্রয়ইড মোবাইল। যে মোবাইলে অনিতা তাকে ভিডিও কল করবে এবং সেখানে অলক তার ছবি দেখতে পাবে। এ যে কী দুঃসহ আর কষ্টদায়ক অলক ছাড়া তা কে আর বোঝে!। পাশাপাশি তবুও যেন কত যোজন যোজন মাইল দূরত্ব, কত তফাতে তাদের দুজনের অবস্থান এই মুর্হূতে! কেউ কাউকে চেনে না যেন! অলক অনেক দূর পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিয়ে দিলো। অনিতা সেই রিক্সায় উঠে অজানা কোন গন্তব্যে চলে যাচ্ছে। আর অলক আস্তে আস্তে অনিতাকে বিদায় জানিয়ে ফিরে এলো শুন্য হাতে! তার মনে হল সমস্ত পথ যেন তাকে ব্যঙ্গ করছে! প্রকৃতি যেন তাকে বিদ্রুপ করছে! বিস্ফারিত ঘরে শূণ্যতার হাহাকার! কেউ থাকে না, সবাই চলে যায়। কেউ সুখ স্মৃতি রেখে যায় আবার কেউ দুঃখের স্মৃতি রেখে যায়। যা একান্ত ভালবাসার মানুষের জন্য নিতান্তই প্রগাঢ় ও গভীর অথচ হাল্কা, দোসর। সেই স্মৃতিই মাঝে-মাঝে হয়ে উঠে মানুষের শেষ অবলম্বন। যা অনিতা অলককে দিয়ে গেল এই মুহূর্তে। রবি ঠাকুরের ভাষায়- "এই পৃথিবীতে কে কার।" বস্তুত: অলকের জীবনের শেষ অধ্যায়টুকু নিংড়ে অনিতা চলে গেল সকল বন্ধন ছিন্ন করে; সে কোন অজানা অনিশ্চয়তার দিকে অলককে ফাঁকি দিয়ে তা কে জানে? অলক নিজেও জানে না॥

২০তম মৃত্যু বার্ষিকী

তোমরা আছ আমাদের হৃদয়ে

২৩তম মৃত্যু বার্ষিকী

প্রয়াত বিচিত্রা রোজলিন গমেজ
জন্ম : ২৯ অক্টোবর, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৪ মার্চ, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ

তোমরা কেমন আছ? তোমাদের খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। এই পৃথিবীর পান্থশালায় আমরা শত দুঃখ কষ্টেও শুধুমাত্র তোমাদের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছি। তোমাদের কথা মনে হলে প্রাণ বারবার কেঁদে ওঠে। এ জগৎ সংসারে তোমাদের সুন্দর জীবন আদর্শের গুণাবলী আমাদের নিত্য দিনের চলার পথের পাথেয়। নিশ্চয়ই তোমরা বাবা-মেয়ে স্বর্গে প্রভুর সাথে সুখে আছ। স্বর্গ হতে প্রতিনিয়ত তোমরা আমাদের জন্যে প্রার্থনা করো, আমরা যেন তোমাদের জীবনের সততা, ন্যায়পরায়ণতা, কর্মঠ ও বিশ্বস্ততা এবং সুন্দর ভালোবাসাপূর্ণ জীবন-যাপন করতে পারি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
স্ত্রী : শিশিলিয়া গমেজ
ছেলে ও ছেলে বউ : দিলীপ-পুষ্প, অনুপ-সম্পা, অসীম-চামেলী ও ব্রাদার রিপন সিএসসি
মেয়ে ও মেয়ে জামাই : সুচিত্রা-হেনরী, সুমী-অপু এবং ভুবন
নাতি-নাতি বউ : জনি-শশী, নিবিড়, অর্পণ ও অনুরুদ্ধ
নাতিন ও জামাই : হ্যাপী-অনিক, কিশোরী-সুজন, বিন্দু-রেক্সি, বৃষ্টি-অনিক, অন্তী, অর্থী, নদী, অর্না, রিমঝিম ও অরিন।
পুতিন : প্রান্তর, সুর, অনয়া, আরিয়া
তুমিলিয়া ধর্মপল্লী

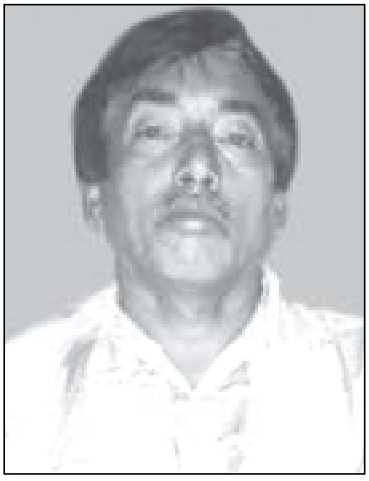

প্রয়াত যোসেফ গমেজ
জন্ম : ৪ এপ্রিল, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১২ মে, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ

বিপ্র/১২৩/২১

যিশুর অপেক্ষা
নোয়েল গমেজ

হে যিশু যখন দেখি
তখন মনে হয় তুমি,
ক্রুশ থেকে নেমে,
আসবে সবার মাঝে।
আলোকিত করবে
সবার হৃদয় ও মন,
পাপময় এই জীবনে,
নিয়ে আসবে সুন্দর সকাল।
যেখানে পাখীরা গান গেয়ে,
উঁড়ে যাবে বিশাল আকাশে,
নদীর কূল-কূল শব্দে,
ভরে যাবে মাঝির মন।
সেই নৌকাতে থাকবে-
দুঃখের দু'টি মানুষ...
তাদের চিন্তা-ভাবনা হবে
সবাইকে নিয়ে।
তাদের প্রার্থনা হবে শুধু,
মানব-সন্তানের সেই যাতনা-ভোগ,
এবং মানব-সন্তানের সেই অপেক্ষা,
যা মনে রাখবে, মানুষ চিরকাল-চিরকাল।

বাস্তবতা
সিস্টার সম্পা গমেজ সিআইসি

করোনা-করোনা-করোনা
সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে করোনা
এটাই কি বাস্তব
হ্যাঁ এটাই সত্য করোনা
তাই সব কিছুই সঠিক
এরই মাঝে কিছু রয় বেঠিক
এটাই কি বাস্তবিক?
এতে রয় অকস্মাৎ সুখ
যদিও এর সাথে থাকে অবিমিশ্র কিছু আনন্দ
এটাই কি বাস্তবিক।
বাস্তবতা প্রকৃত অর্থেই অনশ্বর
সত্যিই অনেকবার তাতো মেনে নিতে হয়
বড় কষ্ট
তবুও সবই বাস্তবিক।
জন্ম মৃত্যু চিরকালীন খেলা
এই সব নিয়ে জীবনের মেলা
সত্যি সবই যে বাস্তবিক।
বাস্তবতা বড়ই কঠিন
যদিও তা মানে না গিয়েও হয় অনেকের
অপরাধ
তারপরও সবই যে বাস্তবিক।
বাস্তবতায় নেই এড়াবার পথ
তা গ্রহণে যে সত্যিই ভয়
তার পরও বলব সবই যে বাস্তবিক।
বাস্তবতাকেই মেনে নেওয়াই জয়
যদিও তাতে হয় বহু সম্পদ ক্ষয়
শেষবারে ও বলা হয়
সবই যে বাস্তবিক।।

অন্ধকার দূর হবে আলো আসবে আবার
স্বপন রোজারিও (মাইকেল)

আবারও বেড়ে গেছে কঠোর লকডাউন,
রাস্তায়ও বেড়ে গেছে প্রাইভেট যানবাহন।
সবই চলছে পথে পাবলিক যান ছাড়া,
করোনা পরিস্থিতিতে মানুষ দিশেহারা।
গুণতে হচ্ছে অনেক টাকা অল্প আয়ের যারা
অক্সিজেনের অভাবে রোগী যাচ্ছে মারা।
কঠোর এই লকডাউন মানতে হবে সবার
অন্ধকার দূর হবে আলো আসবে আবার।

ঘরবন্দির গান
গৌরব জি. পাথাং

মহামারী করোনায় ঘরবন্দি জীবন
বুঝিয়ে দিল কেবা পর কেবা আপন।
আপন হয়ে যায় দুর্দিনে পর
ভুলেও নেয় না তারা কোন খবর
পরই হয়ে উঠে আপনজন।
যন্ত্রের মত ছিল মানব জীবন
সময় ছিল না হাতে খোশগল্পের
কাজের ব্যস্ততায় হারিয়েছিল সুখ
ভালবাসা ছিল শুধু ক্ষণিক-অল্পের
এবার গড়ে তোল প্রেম-বন্ধন।
যেওনাকো বাহিরে নিজ ঘর ছেড়ে
তোমার ঘর তোমার চির আশ্রয়
উজ্জ্বল আলোর রঙিন মার্কেট
হোটেল শপিং মল কোনটাই নয়
পরিবারই তোমারই শান্তিনিকেতন।

বিনম্র রজনী
মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া

ছিল যত তারা আকাশের গায়, ম্লান হয়ে গেল সবই
উচ্ছল দিগন্তে ঘনকালো মেঘ, এঁকেছে বিষন্ন ছবি।
নীলভূমিতে দম্ভ করে বেড়ায়,
অশরীরী গগনচারী
স্থির হয়ে চাঁদ রয় এককোণে, বাতাস ভীষণ ভারী।
দানবের চক্ষু রক্তছায়া ফেলে, লাগে মরণের ভয়
শান্ত আকাশতলে ওঠে গর্জন, জাগে চরম বিস্ময়।
অকুল পাথারে লুকায় দিবাকর, দিগন্তে
অমানিশা
মহাপ্রলয়ে ভাঙ্গে মেঘবাড়ি, নভোচারী হারায় দিশা ।
উড়েউড়ে মেঘ পালায় সুদূরে, বৃষ্টিহীন সুবর্ণ ভূমি
নিশ্চুপ বৃক্ষরাজ রোপিত বীজ,
উঠে না গর্ভচুমি।
শূন্য ধরাতল, বাগান বাড়ি, কেবলই ধূসর মরু
ধূলির ঝড় বাড়ায় তাণ্ডব, ফোটে না গন্ধতরু।

বাজাবে কে বাঁশি নাশিবে শঙ্কা,
ছড়াবে দিব্যজ্যোতি
গগনে উঠবে চাঁদ ও তারা, নিশিতে জ্বলবে বাতি।
আকাশ ধরনী রবে অম্লান,
আসবে বিনম্র রজনী
দানবের দম্ভ হবেই চূর্ণ,
কাননে ফুটবে কামিনী।

অর্ঘ্য
উইলিয়াম রনি গমেজ

মৃত্যুর খুব কাছ থেকে জেনেছি
জীবন কী?
বেঁচে থাকার কি দূরন্ত নির্লোভ বাসনা
প্রতিটি মানুষের।
প্রতি মূহুর্তে মৃত্যু;
প্রতি মূহুর্তে বেঁচে থাকার দুর্দান্ত সংগ্রাম।

মৃত্যুর খুব কাছ থেকে বুঝেছি
সত্যিকারের বেঁচে থাকাটা আসলে কি?
প্রিয়জন ছেড়ে অচেনার ওপারে চলে যাওয়ার
কষ্টটুকুই বা কি?
বিশাল, বিস্তীর্ণ প্রকৃতির দিকে চেয়ে
প্রার্থনা করেছি সবুজ নির্মল বায়ুতে
জুড়িয়ে যাক ফুসফুস
পরিপূর্ণ অক্সিজেনে।

বৃষ্টির অবিরাম ধারাকে বলেছি
ধুয়ে মুছে সম্পূর্ণ সূচী শুভ্র করে দাও আমাকে।
চাঁদের স্নিগ্ধ আলোকে বলেছি
দীক্ষা দাও নতুন জীবনের
নতুন আলোতে ভরিয়ে দাও
আমার আধার ভুবন...।

বেঁচে উঠেছি, এক এক অপার আনন্দ
বিধাতা আমার!
শত-সহস্র প্রতিকূলতা হতে আমাকে
উদ্ধার করেছো
শত কোটি ভক্তি প্রণাম আর
পূজার নৈবেদ্য তাই তোমারই পদতলে॥

আলোচিত সংবাদ

লকডাউনের বিধিনিষেধ ৫ মে পর্যন্ত কার্যকর

করোনাভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে চলমান লকডাউনের বিধিনিষেধ আরো এক সপ্তাহ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। গত ১৪ এপ্রিল থেকে দেশে যে কঠোর বিধিনিষেধ চলছে, তার মেয়াদ ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত ছিল। এখন এক সপ্তাহ বেড়ে তা ৫ মে পর্যন্ত কার্যকর হয়েছে। বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে কোভিড-১৯ বিস্তার রোধে চলমান বিধিনিষেধ আরো এক সপ্তাহ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর আগে যে বিধিনিষেধগুলো ছিল, সেগুলো এখনও কার্যকর হবে। তবে এ সময় দোকানপাট ও শপিংমল সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চালু থাকবে।

ঈদগাহে নয়, ঈদুল ফিতরের নামাজ হবে মসজিদে

ঈদগাহ বা খোলা জায়গার পরিবর্তে পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজের জামাত নিকটস্থ মসজিদে আদায়ের অনুরোধ জানিয়েছে সরকার। সোমবার ২৬ এপ্রিল ধর্ম মন্ত্রণালয় ঈদের নামাজ নিয়ে নির্দেশনা জারি করে। নির্দেশনায় বলা হয়, করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার কারণে আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজের জামাত ঈদগাহ বা খোলা জায়গার পরিবর্তে নিকটস্থ মসজিদে আদায় করতে হবে। যারা মসজিদে নামাজ আদায় করতে আসবেন, তাদের প্রত্যেককে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। মাস্ক পরিধান করতে হবে। নামাজ আদায় করার সময় শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। জামাত শেষে কোলাকুলি করা যাবে না। নির্দেশনায় আরও বলা হয়-

ঈদের নামাজের জামাতের সময় মসজিদে কার্পেট বিছানো যাবে না। নামাজের পূর্বে সম্পূর্ণ মসজিদ জীবাণুনাশক দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে। মুসল্লিরা প্রত্যেকে নিজ-নিজ দায়িত্বে জায়নামাজ নিয়ে আসতে পারবেন। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধ নিশ্চিতকল্পে মসজিদে ওযুর স্থানে সাবান/হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখতে হবে। মসজিদের প্রবেশদ্বারে হ্যান্ড স্যানিটাইজার/হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ সাবান-পানি রাখতে হবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ বাসা থেকে ওযু করে মসজিদে আসতে হবে এছাড়াও আরো অনেক নির্দেশনা ছিল।

অনলাইনেও নিত্যপণ্য বিক্রি করবে টিসিবি

ট্রাক সেলের পাশাপাশি এখন থেকে অনলাইনেও নিত্যপণ্য বিক্রি করবে সরকারের বিপণন সংস্থা ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। ভোজ্য তেল, ছোলা, চিনি এবং মসুর ডাল এ চারটি পণ্য বিক্রয় করা হবে। 'মাহে রমযানে ঘরে বসে স্বস্তির বাজার' কার্যক্রমের আওতায় সোমবার থেকে শুরু হওয়া এ পণ্য বিক্রি চলবে আগামী ৬ মে পর্যন্ত। ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ই-ক্যাব) ডিজিটাল হাট ডট নেট এর ৮টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যে এ সব পণ্য বিক্রয় করা হবে। বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি অনলাইনে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ যাতে এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য সরকার ই-কমার্সের সহযোগিতায় ভোজ্য তেল, ছোলা, চিনি এবং ডাল বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে মানুষ ঘরে বসে পণ্য ক্রয়ের সুযোগ পাবে।

প্রতি লিটার ভোজ্য তেল ১০৮ টাকা এবং চিনি, ছোলা, ডাল ৫৮ টাকা কেজি দরে বিক্রয় করা হচ্ছে। একজন ক্রেতা সপ্তাহে ৫ লিটার তেল এবং ৩ কেজি করে চিনি, ছোলা, ডাল ক্রয়ের সুযোগ পাবেন। ডেলিভারি খরচ ঢাকা শহরে সর্বোচ্চ ৩০ টাকা এবং ঢাকার বাইরে ৪০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ঢাকা, টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জ জেলায় অনলাইনে পণ্য বিক্রির এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টে ১০ কোটি টাকা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা সংক্রমণের এই দুঃসময়ে দেশব্যাপী সাংবাদিকদের সহযোগিতার জন্য 'সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট'কে ১০ কোটি টাকা দিয়েছেন। ২৭ এপ্রিল মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম স্বাক্ষরিত এ বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা সংক্রমণের এই দুঃসময়ে দেশব্যাপী সাংবাদিকদের সহযোগিতার জন্য 'সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট'কে ১০ কোটি টাকা দিয়েছেন।

ভারতে আটকা পড়া বাংলাদেশিরা এনওসি নিয়ে দেশে ফিরতে পারবেন

ভারতের করোনা পরিস্থিতির অবনতির কারণে দুই সপ্তাহের জন্য সীমান্ত বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এমন পরিস্থিতিতে ভারতে ভ্রমণরত বাংলাদেশীদের দেশে ফেরাতে উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সেক্ষেত্রে অবশ্যই বাংলাদেশের কলকাতা উপহাইকমিশন থেকে এনওসি (অনাপত্তিপত্র) নিতে হবে। বাংলাদেশের কলকাতা উপহাইকমিশন এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বলেছে, ২৬ এপ্রিল থেকে ৯ মে পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের স্থলসীমান্তে বিদেশিদের সব ধরনের যাতায়াত বন্ধ থাকবে। এ সময় উপহাইকমিশনে ভিসা সেবা ও স্থলসীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশিদের চলাচলও বন্ধ থাকবে।

যেসব বাংলাদেশী এই মুহূর্তে ভারত সফরে রয়েছেন এবং ভিসার মেয়াদোত্তীর্ণতাজনিত কারণে তাদের বাংলাদেশে ফেরত আসা প্রয়োজন তাদেরকে বেনাপোল-পেট্রাপোল স্থলসীমান্ত দিয়ে দেশে ফেরার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ৭২ ঘণ্টার মেয়াদ থাকা তাদের কোভিড নেগেটিভ সার্টিফিকেট এবং কলকাতার বাংলাদেশ উপহাইকমিশন থেকে এনওসি নিতে হবে বাংলাদেশে প্রবেশের আগে। বাংলাদেশে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাদের প্রয়োজনীয় কোয়ারেন্টিনের ব্যবস্থা করবে। যেকোনো প্রয়োজনে বাংলাদেশ হাইকমিশনের যোগাযোগ করা যাবে +৯১৩৩৪০১২৭৫০০ নম্বরে। এ ছাড়া উপহাইকমিশনের ফেসবুক ও টুইটারেও যোগাযোগ করা যাবে।

ভিডিও কনফারেন্সিং দেশি অ্যাপ 'বৈঠক' চালু

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ এড়াতে গত বছর থেকে অসংখ্য মানুষ বাসায় থেকে অফিস করেছেন। সহকর্মীদের সঙ্গে বিভিন্ন মিটিং ও আলোচনায় অংশ নিয়েছেন ভিডিও কনফারেন্সিং বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে। সম্ভাবনাময় ও সময়ের চাহিদার শীর্ষে থাকা ভিডিও কনফারেন্সিং অ্যাপের বাজার ধরতে দেশীয় প্রোগ্রামারদের তৈরি করা ভিডিও কনফারেন্সিং প্ল্যাটফর্ম 'বৈঠক' পরীক্ষামূলকভাবে চালু করেছে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) মন্ত্রণালয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন রবিবার 'বৈঠক' অ্যাপে অনুষ্ঠিত এক আয়োজনে এ প্ল্যাটফর্মের উদ্বোধন করেন। আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক অনুষ্ঠানে জানান, প্রাথমিকভাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বৈঠক অ্যাপ ব্যবহার করবে। এরপর সরকারি অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং পরে সাধারণ মানুষের জন্য অ্যাপটি উন্মুক্ত করা হবে।

সংকটেও সফল তরুণরা

করোনা মহামারিতে বিশ্ব যখন সংকট আর অনিশ্চয়তায় তখনো কিছু তরুণ তাদের পরিশ্রম ও অসামান্য অবদানে ছড়াচ্ছেন আলো। প্রযুক্তিভিত্তিক উদীয়মান খাতে অবদান এবং মানুষের জীবনমান ও সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখায় এ বছর ফোর্বস ম্যাগাজিনের 'থার্টি আন্ডার থার্টি এশিয়া ২০২১' তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন বাংলাদেশের ৯ তরুণ। ২০১১ খ্রিস্টাব্দে ব্যবসাবিষয়ক ম্যাগাজিন ফোবর্স এই তালিকা করা শুরু করে। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০২০ পর্যন্ত মোট ৯ বাংলাদেশি এই তালিকায় স্থান পান। আর ২০২১ এ এসে এক বছরেই ৯ তরুণ সম্মানজনক এই স্বীকৃতি পেলেন, যা করোনা সংকটেও বাংলাদেশকে একটি সম্ভাবনার কথা জানাচ্ছে।

প্রযুক্তি উদ্যোক্তা বিভাগে স্থান পাওয়া তিন বাংলাদেশি হচ্ছেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ভিত্তিক উদ্যোগ 'গেজ টেকনোলজিসের প্রতিষ্ঠাতা শেহজাদ নূর তাওস প্রিয় (২৪), মোতাসিম বীর রহমান (২৬) এবং স্টার্টআপ স্ক্রামস্ট্যাকের প্রতিষ্ঠাতা মীর সাকিব (২৮)। সামাজিক প্রভাব ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের তিনজন সম্মানিত হয়েছেন। তারা হলেন 'অ্যাওয়ারনেস ৩৬০' এর সহপ্রতিষ্ঠাতা শোমি চৌধুরী (২৬) ও রিজভী আরেফিন (২৬) এবং অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশনের আহমেদ ইমতিয়াজ জামি (২৭)। সেরার তালিকায় থাকা বাংলাদেশের বাকি তিনজন হলেন হাইড্রোকো প্লাসের প্রতিষ্ঠাতা রিজভানা হৃদিতা (২৮) ও মো. জাহিন রোহান রাজীন (২২) এবং পিকাবোর সহপ্রতিষ্ঠাতা মোরিন তালুকদার (২৭)। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ঢাকাভিত্তিক হাইড্রোকো প্লাস নিরাপদ পানি নিয়ে কাজ করে। সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সেবামূলক সংস্থা পানির গুণগত মান নিয়ে করা তাদের প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে॥

উৎস : দৈনিক জনকণ্ঠ, ইত্তেফাক ও কালেরকণ্ঠ

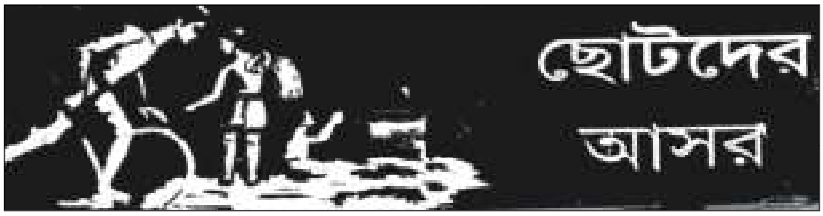

প্রসন্ন চিত্তে দাও এবং গ্রহণ কর

টাকা দেওয়া অনেক আনন্দের এবং ঐ টাকা দিয়ে প্রয়োজনের সময় নানা জিনিস কেনা যায়, যাতে তোমার পরিবার ও বন্ধুবর্গ সেগুলি ব্যবহার করতে পারে। আর দরিদ্র, গৃহহীণ মানুষ এবং রোগীদের জন্য আরো বেশি আনন্দের।

যদি তোমার অন্তর কঠিন এবং নিরস অনুভূত হয়, দান করলে সেই অন্তর রেশমী বস্ত্রের ন্যায় কোমল হয়ে উঠবে। আর যখন তুমি কাউকে কিছু দান কর, তুমি দেখবে যে, সেই মানুষটিকে তুমি আরে বেশি ভালবাসতে পারছ। অন্য লোকদেরও তুমি আরো বেশি ভালবাসবে।

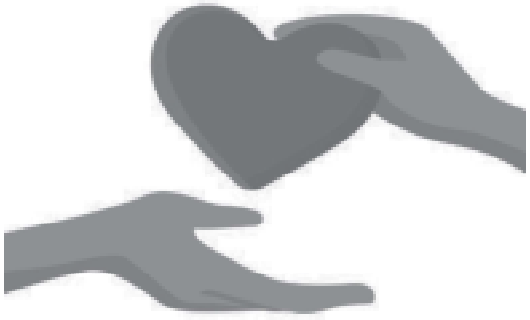

কেউ কখানো তোমাকে উপহার দিলে তা খুশীমনে গ্রহণ কর। ফিরিয়ে দিও না। দানের জন্য গ্রহীতার প্রয়োজন -খুশি গ্রহীতা।

বই : ৬০টি উপায়ে, নিজেকে বিকশিত হতে দাও

মূল লেখক : মার্থা মেরী মনগ্যা সিএসসি

অনুবাদ : রবি খ্রিস্টফার ডি'কস্তা (প্রয়াত)

প্রার্থনা

হে প্রভু, মনিষীরা বলেছেন, "নিশেষে প্রাণ, যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই"। দান করা যেমন আনন্দের, তেমনি গ্রহন করা ও আনন্দের। দানের সাথে-সাথে কঠিন এবং নিরস মন আনন্দে ভরে ওঠে। প্রসন্নচিত্তে আমি যেন দান করি এবং দান করি। - আমেন।

ঐশ কৃপায় মনোনীত জন

অন্তর দাস

দায়ূদ বংশের মানুষ যিনি
ঐশ কৃপায় মনোনীত জন তিনি
পরম পিতার মহা পরিকল্পিত
যোসেফ হয়ে জন্মিলে তুমি।

দায়ূদ বংশের মানুষ যিনি
মুক্তিদাতার খ্রিস্টের পালক পিতা তিনি
মা-মারিয়ার পূণ্যশীল
স্বামী হইয়া জন্মিলে তুমি।

আজি ঐশ কৃপায় কৃপাময় পূণ্য হে তুমি
কঠোর শ্রমের আদর্শ শ্রমিক তুমি
আজি বিশ্ব সভায় পূজিত তুমি
নমঃ হে নমঃ হে মহান তুমি।

তাই স্বর্গীয় আশীষ আনো আজি
বিশ্ব পিতাকে করিয়া রাজি,
যেন দিন-মজুর আর কুলি-মুটে
ন্যায্যতা পায় আজি।

অন্যায্যতা আর অরাজকতা
তাই সমতার আশীষ আনো হে আজি
বিশ্বকে করিতেছে গ্রাস আজি
বিশ্ব পিতাকে করিয়া রাজি।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

ম্যানি ফার্দিনান্দ পেরেরা
সেন্ট ভিনসেন্ট ডি'পল প্রাইমারী স্কুল
২য় শ্রেণি

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

৪দিনে ইণ্ডিয়া হারালো ১৪জন কাথলিক যাজককে

কোভিড -১৯ সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ ইণ্ডিয়ার স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিয়েছে এবং সারাদেশ থেকে খবর এসেছে ২০ থেকে ২৩ এপ্রিল এ ৪দিনে মোট ১৪জন কাথলিক যাজক করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

ইণ্ডিয়ায় কোভিড-১৯ সংকট : করোনাভাইরাসের মহামারির দ্বিতীয় ধাক্কায় নাকাল অবস্থা ইণ্ডিয়ার। প্রতিদিনই রোগি বাড়ছে। বাড়ছে মৃত্যুর হার। শ্মশানে দিন-রাত জ্বলছে চিতা। হাসপাতালে শয্যার সংকট, অক্সিজেন সংকটসহ নানা সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করছে। এরমধ্যে উদ্বেগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে পরিবর্তিত হয়ে তৈরি হওয়া করোনাভাইরাসের নতুন ধরণ। ইণ্ডিয়ার সংবাদমাধ্যম জানায়, গত কয়েকদিন ধরেই দেশে রোগি শনাক্তের সংখ্যা তিন লাখের ওপরে। দিনে-দিনে এই সংখ্যা বাড়ছে। গত ৫দিন ধরেই তিন লাখের বেশি রোগি সনাক্ত হচ্ছে। তার আগে ১৫ এপ্রিল থেকে দেশটিতে প্রতিদিন দুই লাখের বেশি করোনা রোগি শনাক্ত হচ্ছিল। আর ছয়দিন ধরে ভারতে দুই হাজারের বেশি মানুষ করোনায় মারা যাচ্ছে। ১৬ মিলিয়ন আক্রান্ত করোনা রোগি নিয়ে ইণ্ডিয়া যুক্তরাষ্ট্রের পরেই রয়েছে।

করোনার এই সংকট শেষকৃত্য অনুষ্ঠানকেও স্পর্শ করেছে। মৃতব্যক্তির পরিবারগুলো দিনকে দিন অপেক্ষা করছে তাদের প্রিয়জনদের শ্রদ্ধা জানিয়ে সমাহিত করতে। ইণ্ডিয়াতে কাথলিক রীতি এবং সিরো মালাবার ও সিরো মালাঙ্কারা রীতিতে বিশ্বাসী কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মপ্রদেশীয় ও সন্ন্যাসব্রতী যাজকদের সংখ্যা ৩০,০০০জন। মাত্র ৩দিনে দেশের বিভিন্নস্থানে ১৪জন মারা গেছেন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এবং ১মাসে হারিয়েছে ২০জন যাজককে।

২৩ এপ্রিল মারা গেছেন নাগপুর আর্চডায়োসিসের ৩৮ বছরের তরতাজা যুব যাজক ফাদার লিজো টমাস। একইদিনে ঝাড়খান্ডের ডুমকা ডায়োসিসের ৫৮ বছরের যাজক ফাদার এস খ্রিস্টদাস মারা যান। কোভিড থেকে সেরে উঠলেও পরবর্তী দুর্বলতায় বাথরুমে পড়ে তিন মারা যান। তিনি আদিবাসী অধিকার নিয়ে স্বোচ্চার ছিলেন। ঐদিনেই জেজুইট সংঘের ফাদার শ্রীনিবাসান, দিয়াগো ডি'সূজা এবং আরুলসামি মারা যান। করোনা আক্রান্ত হয়ে ২২ এপ্রিল মারা যান র‍্যাঙ্গালুরু ডায়োসিসের ফাদার মার্টিন আন্তুনী ও কার্নাটকের ফাদার প্রবীণ ঋদুরাজ। ২১ এপ্রিলে মারা যান লক্ষ্মৌর ফাদার বসন্ত লাকড়া, পাটনার ফাদার জর্জ কারামায়িল এসজে, ফাদার টসাম আক্কারা এসডিবি, ফাদার যোসেফ খেরুজসেরিল ও ফাদার থিওডোর টপ্য। ২০ এপ্রিলে মারা যান রাইপুর আর্চডায়োসিসের ফাদার আন্তুনী কুন্নাদ ও মেরুত ডাইয়োসিসে ফাদার সঞ্জয় ফ্রান্সিস। এছাড়াও মহিলা ধর্মসংঘেও করোনাভাইরাস বেশ আঘাত করেছে।

আর্মেনিয়ার জন্য পোপ মহোদয়ের চিকিৎসা সরঞ্জাম উপহার

পোপের প্রতিনিধি আর্চবিশপ হোসে বেটেনকোর্ট অ্যাম্বুলেন্স আশীর্বাদ করছেন

আর্মেনিয়াতে পোপের প্রতিনিধি পুণ্যপিতার যত্ন ও বিবেচনার বাস্তব চিহ্ন বিতরণ করেন। গত রবিবার (২৫/০৪/২১) পোপের প্রতিনিধি আর্মেনিয়ার উত্তরাঞ্চলে আসোটক শহরে অবস্থিত কাথলিক 'রিডেমটোরিস মাতের' হাসপাতালের জন্য পোপ মহোদয়ের দেওয়া উপহার আশির্বাদ করেন।

কোভিড মোকাবেলার সরঞ্জাম : ভাতিকানের প্রেস অফিসের বিবৃতিক্রমে, পোপের উপহার হিসেবে রয়েছে মোবাইল চিকিৎসা সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত অত্যাধুনিক একটি অ্যাম্বুলেন্স এবং কোভিড-১৯ রোগিকে সহায়তাদানের জন্য শ্বাস সচল রাখার কৃত্রিম যন্ত্র।

এ উপহার গ্রহণে হাসপাতালের পরিচালক ফাদার মারিও কুকারাল্লোর সাথে আর্চবিশপ বেটেনকোর্ট পূর্ব ইউরোপের উপাসনা রীতি পালনে অংশগ্রহণ করেন। দেশের কাথলিক স্বাস্থ্য দপ্তর হাসপাতালের প্রয়োজনে কোভিড রোগীদের চিকিৎসার জন্য ও কোভিড পরীক্ষার জন্য আরো প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয় করে।

আর্মেনিয়া করোনাভাইরাসের সংক্রমনের তৃতীয় ঢেউ থেকে বেরিয়ে আসছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। ৩০ লক্ষ জনসংখ্যার দেশটিতে গত ২৪ ঘন্টায় ৪১০টি নতুন সংক্রমনের কথা জানা গেছে।

পোপ ফ্রান্সিসের এই উপহার সহজে পৌঁছে দিতে ভাতিকানের বেশ কয়েকটি সংস্থা একসাথে কাজ করেছে। এই দয়ার কাজে পোপের প্রতিনিধির সাথে সমন্বিত মানব উন্নয়ন দপ্তরের সহযোগী মানবিক সংস্থা 'গুড সামারিতান ফাউন্ডেশন' সক্রিয় অংশ নিয়েছে। পোপ মহোদয়ের এই উপহার এসে পৌঁছে আর্মেনিয়ার গণহত্যা দিবস বার্ষিকীর পরের দিন। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় অটোমান সম্রাট পাশবিকভাবে অসংখ্য আর্মেনীয় খ্রিস্টানদের হত্যা করেছিল।

আসোটক শহরের 'রিডেমটোরিস মাতের' হাসপাতালটি পরিচালনা করেন কামিলিয়ান ফাদারগণ এবং যারা দরিদ্র তাদেরকে কমমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছে। যারা একদমই চিকিৎসাব্যয় বহন করতে অপারগ তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দিচ্ছেন কামিলিয়ান ফাদারগণ। বিগত ২৫ বছর যাবৎ তারা এ সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

মহামারী-উত্তর জীবনের কেন্দ্রস্থলে রাখুন খ্রিস্টযাগকে

– ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের বিশপগণ

গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের বিশপদের বসন্তকালীন বিশেষ সভায় এ বিবৃতি দেওয়া হয় যে, মহামারী-উত্তর সময়ে রবিবারের খ্রিস্টযাগকে জীবনের কেন্দ্রস্থলে রাখতে হবে। মহামারী-উত্তর পুনরুদ্ধার এর উপর গভীর অনুধ্যান রেখে বিশপগণ বিশ্বাসীবর্গকে উৎসাহ দিয়ে বলেন, মণ্ডলীতে ও এর সাক্রামেন্তসমূহে ফিরে এসো।

'প্রভুর দিন' শিরোনামে চিঠিতে বিশপগণ পরিবার, ধর্মপল্লী এবং গত বছরের কঠিন সময়ে যারা হাসপাতালে, কেয়ার হোমসে, স্কুলে এবং কারাগারে অক্লান্ত সেবা দিয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। বিশপগণ পুরোহিতদের নেতৃত্বের উপরও বিশেষ নজর রেখেছেন এবং যেসকল পুরোহিতেরা দীনতমদের খাদ্য সরবরাহ করতে অপরিসীম প্রচেষ্টা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

বিভিন্ন সময়ে খাদ্য বিতরণের মধ্যদিয়ে প্রকাশ পেয়েছে উদারতা যা মূর্ত করে তুলেছে ঈশ্বরের হৃদয়ের দয়া, ভালবাসা ও করুণা। এই বিশেষ সময়ে দরিদ্রদের মধ্যে খ্রিস্ট সাক্ষাতের আনন্দ অনেককে আকর্ষিত করেছে এবং অনেক দরিদ্র জনগণও খ্রিস্টের আনন্দ দেখতে পেয়েছে ধর্মপল্লীবাসীর নিঃস্বার্থপরতার মধ্যে।

মহামারী-উত্তর চ্যালেঞ্জঃ মহামারীকালে বিভিন্ন পদ্ধতিতে দীনদরিদ্রদের কাছে পৌঁছানোকে বিশপগণ প্রভূত প্রশংসা করার সাথে বিশেষ জোর দেন মহামারী-উত্তর বিশ্বের দিকে। বিশ্বাসীদের সমাবেশ এবং বিশ্বাসের অনুশীলন এখনও বৃহত্তর প্রকাশ ও শক্তি- এবোধ আনয়ন করতেই বিশপগণ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন এবং তারা নির্দিষ্ট দল চিহ্নিত করছেন যাতে সেখানে পৌঁছতে পারেন। বিশপগণ উল্লেখ করেন এ দলের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা গির্জায় যাবার অভ্যাস একরকম হারিয়ে ফেলেছিলেন কিন্তু মহামারীর সময় প্রথমবারের মতো কেউ ফিরে এসেছেন। তাই তাদেরকে কোভিড কৌতুহলী আখ্যায়িত করা হচ্ছে। অন্য আরেকটি দল আছে যারা কাথলিক ভক্তি-উপাসনা পুনরুদ্ধার করতে চান না এবং যারা কাথলিকদের আধ্যাত্মিকতা ও তাদের জীবনে তা প্রকাশের ক্ষেত্রে ভীষণ বৈসাদৃশ্য দেখেন।

মণ্ডলীর সম্পদঃ উপরোক্ত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার জন্য মণ্ডলীর সত্যিকারের প্রধান সম্পদ হলো 'খ্রিস্টযাগ'। খ্রিস্টযাগ, রবিবারের পুণ্য উপাসনা যা মণ্ডলী গড়ে তোলে এবং পবিত্র আত্মার উপহার এই মণ্ডলীই খ্রিস্টযাগ অনুশীলন করে। খ্রিস্টযাগে পুণ্য বলি হলো মণ্ডলীর জীবন। তাই এই উৎসবে আমাদের শারীরিক উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ আবশ্যক। মহামারী-উত্তর সময়ে রবিবারের খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণকে জীবনের কেন্দ্রে স্থান দেবার আহ্বান রাখেন ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের বিশপগণ॥

- তথ্যসূত্র : *news.va*

জাফলং ধর্মপল্লীতে যুব সেমিনার

মেলকম খংলা ▯ “প্রকৃতির যত্নে যুবদের করণীয়” এই মূলসুরের আলোকে গত ১১ এপ্রিল, রবিবার, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে সাধু প্যাট্রিকের ধর্মপল্লী, জাফলং, রাধানগর, ঘোয়াইনঘাট সিলেটে এক যুব সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই সেমিনারে ২জন ফাদার ও জাফলং ধর্মপল্লীর ৪৭ জন যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেন। সকাল ১০:৩০ মিনিটে খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার পিন্টু কস্তা ওএমআই। তিনি তার উপদেশে- “ঐশ করুণা” সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, ঐশ করুণা পর্বটি কিভাবে এসেছে। কিভাবে মানুষ তাদের ভক্তি ও ভালবাসা দিয়ে এই পর্বটি উৎযাপন করছে। যিশু কিভাবে আমাদের দয়া দেখিয়েছেন। খ্রিস্টযাগের পর মূলসুর-“প্রকৃতির যত্নে যুবদের করণীয়” সে সম্পর্কে জাফলং ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা সুন্দর সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন- প্রকৃতি ঈশ্বরের দান। ঈশ্বর আমাদের জন্য প্রকৃতি দিয়েছেন যেন আমরা যুব হিসেবে যত্ন নেওয়ার মধ্যদিয়ে এই পৃথিবীকে আরও বাসযোগ্য করে গড়ে তুলি। তিনি বলেন- গাছ রোপণ করার মধ্যদিয়ে, গাছের পাতা অযথা না ছিঁড়ে বা গাছকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার মধ্যদিয়ে, প্লাস্টিক এখানে সেখানে না ফেলে, পানি অপচয় রোধ করে, মোট কথা প্রকৃতিতে যা রয়েছে তা সদব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃতিকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারি। সেই সাথে তিনি আরও বলেন- এই বছর আমরা পোপের আরও দুটি পত্রের উপর গুরুত্ব দিচ্ছি। “আমরা সবাই ভাই-বোন” -কারণ আমরা সবাই একই উৎস থেকে এসেছি। তাই একে অন্যের সাথে সম্পর্ক গড়তে, কাছে টানতে, সহযোগিতা করতে যেন উদ্যোগী হই। সেই সাথে সাধু যোসেফের বর্ষে যেন সাধু যোসেফকে নিয়ে ধ্যান করি। তাঁর গুণাবলীগুলো আমাদের জীবনে ধারণ করি সেই আঙ্গিকে জীবন-যাপন করি। তার সহভাগিতা ছিল প্রাণবন্ত ও বাস্তবধর্মী যা সবাইকে উৎসাহিত করেছে প্রকৃতির যত্ন নিতে ও সাধু যোসেফের অনুকরণে জীবন গঠন করতে। পালকীয় পরিষদের সেক্রেটারী ওয়েলকাম লম্বা কিভাবে যুবরা খাসিয়া সমাজে আরও বেশি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই বিষয়ে বাইবেলের আলোকে তাদের উপযোগী করে সহভাগিতা করেন। এতে সবাই স্বর্তস্ফূর্তভাবে সাড়া দান করে। যুবক-যুবতীরা তার সহভাগিতা থেকে তাদের সমাজ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারছে এবং আরও অবদান রাখতে অনুপ্রাণিত হয়েছে। ফাদার পিন্টু কস্তা ওএমআই “মূল্যবোধের” উপর সুন্দর সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন-মূল্যবোধ কি, কিভাবে আমরা মূল্যবোধ অর্জন করতে পারি, মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে জীবন গঠন করলে আমাদের জীবন কেমন হবে, কত ধরনের মূল্যবোধ আছে তা তিনি যুবদের উপযোগী করে সহভাগিতা করেন। তার সহভাগিতা ছিল যুবদের জন্যে খুবই উপযোগী। যা তাদের বিবেককে নাড়া দিয়েছে ও তাদের সচেতন করেছে। যোশুয়া খংস্লিং, জাফলং ধর্মপল্লীর রাংবাবালাং বলেন- মণ্ডলীতে কোন কোন ক্ষেত্রে, কিভাবে যুবরা আরও বেশি অংশগ্রহণ করতে পারে। তাদের ভূমিকা কেমন হতে হবে? সেই সম্পর্কে খাসিয়া ভাষায় সুন্দর সহভাগিতা করেন। সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণে এবং যোশুয়া খংস্লিয়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে বিকাল ৩টায় দুপুরের খাবারের মধ্যদিয়ে যুব সেমিনারের সমাপ্ত হয়॥

রমনা সেমিনারীতে নববর্ষ উদ্‌যাপন এবং সহকারী পরিচালককে বরণ

অর্নব জাস্টিন হালদার ▯ গত ১৪ এপ্রিল, রোজ বুধবার ২০২১ খ্রিস্টাব্দ (১লা বৈশাখ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ) রমনা সাধু যোসেফের সেমিনারীতে আড়ম্বর এবং ভাবগাম্ভীর্যের সাথে ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যে পালন করা হয় "পহেলা বৈশাখ" এবং সেমিনারীর নতুন সহকারী পরিচালক হিসেবে বরণ করে নেওয়া হয় ফাদার মার্টিন মন্ডলকে। দিনের শুরুতে সকালে বিশেষ প্রার্থনা ও "এসো হে বৈশাখ" নামক একটি দেয়ালিকা প্রকাশ করা হয়। বিকেলে বাংলা নববর্ষ উৎসব এবং সহকারী পরিচালকের বরণ উপলক্ষে এক বিশেষ খ্রিস্টযাগের আয়োজন করা হয়। সকল বিশপ, যাজক এবং সেমিনারীয়ানদেরকে খ্রিস্টযাগের প্রাক্কালে তিলক চন্দনের মাধ্যমে খ্রিস্টযাগের আমন্ত্রণ জানানো হয়। অতঃপর প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ হাতে নিয়ে শোভাযাত্রার মাধ্যমে চ্যাপেলে প্রবেশ করা হয়।

খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্য করেন আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই। এছাড়াও তাকে সহযোগিতা করেন আরো ৮জন যাজক। উপদেশ বাণীতে আর্চবিশপ মহোদয় বলেন; আমরা যেন আজকের কাজ আজকেই করি, আগামীকালের জন্য কোনো কিছুই রেখে না দিই। নতুন বছরে এই হোক আমাদের সংকল্প।"

পরে সান্ধ্যভোজ শেষে সেমিনারীর সাংস্কৃতিক কমিটির আয়োজনে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে নতুন সহকারী পরিচালককে বরণ করে নেওয়া হয় এবং তার উদ্দেশ্যে অভিনন্দন পত্র পাঠ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের সবকিছুই ছিল সহকারী পরিচালক এবং বাংলা নববর্ষকে কেন্দ্র করে। সর্বশেষে আধ্যাত্মিক পরিচালকের সমাপনী বক্তব্য এবং শেষ আশীর্বাদ প্রদানের মধ্যদিয়ে উক্ত দিনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়॥

অন্তিম যাত্রায় সিস্টার মেরী আনন্দ এসএমআরএ

জন্ম : প্রয়াত শ্রদ্ধেয়া সিস্টার মেরী আনন্দ এসএমআরএ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর রাঙ্গামাটিয়া গ্রামে ১৮ জানুয়ারি ১৯৪১ খ্রিস্টবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মৃত মনাই আন্তনী কস্তা ও মাতা মৃত ম্যাগডেলিনা কস্তা। দুই ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম সন্তান।

মৃত্যু : তিনি ১৫ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টবর্ষ, বৃহস্পতিবার, তুমিলিয়া সেন্ট মেরীস কনভেন্টে বার্ধক্যজনিত কারণে সকাল ৯:১০ মিনিটে পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে চলে যান।

১ম ব্রতগ্রহণ : ৬ জানুয়ারি ১৯৬২ খ্রিস্টবর্ষ।
আজীবন ব্রতগ্রহণ : ৬ জানুয়ারি ১৯৬৮ খ্রিস্টবর্ষ।

প্রৈরিতিক জীবন

শ্রদ্ধেয়া সিস্টার আনন্দ এসএমআরএ একজন নিবেদিতপ্রাণ সন্ন্যাসব্রতিনী ছিলেন। তিনি ১৯৬৪ খ্রিস্টবর্ষ হতে ২০১৪ খ্রিস্টবর্ষ পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিণী সংঘের বিভিন্ন কনভেন্টে অবস্থান করে প্রাইভেট ও সরকারী প্রাইমারি স্কুলগুলোতে একজন আদর্শ শিক্ষিকা ও প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। বিশেষভাবে তিনি নাগরী, মঠবাড়ী, মরিয়মনগর, তেজগাঁও, বটমলী হোম, তুমিলিয়া, চড়াখোলা ও শুলপুর প্রাইমারি স্কুলে এমনকি কোন কোন স্থানে একাধিকবারও শিক্ষকতা ও প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন।

এছাড়াও তিনি ঢাকা কমলাপুর বৌদ্ধ স্কুলে এবং সিলেট লক্ষীপুরে নিষ্ঠার সাথে শিক্ষকতাসহ অন্যান্য প্রৈরিতিক কাজ সম্পন্ন করেন। এমনিভাবে তিনি ৫০টি বছর প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে নিষ্ঠার সাথে সেবাদান করে গেছেন।

২০১৫ খ্রিস্টবর্ষ হতে ২০২০ খ্রিস্টবর্ষের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে মেরীহাউজে অবস্থান করেন। এসময়ও তিনি আন্তরিকতার সাথে আশ্রম সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

২০২০ খ্রিস্টবর্ষের অক্টোবর মাসে অসুস্থতা শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে সিস্টারকে তুমিলিয়া শান্তিভবনে নিয়ে আসা হয় এবং ১৫ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টবর্ষ, বৃহস্পতিবার সকাল ৯:১০ মিনিটে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তার এ ত্যাগময় সেবার জীবনের জন্য আমরা পরম পিতার ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি।

প্রয়াত শ্রদ্ধেয়া সিস্টার আনন্দ ব্যক্তিজীবনে ছিলেন হাসিখুশি প্রাণোচ্ছল, নিবেদিতপ্রাণ একজন সন্ন্যাসব্রতিনী। পরমপিতা তাকে বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত করে সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষিকা, নাট্যকার, সুগায়িকা ও সদালাপী। তিনি শিশু, কিশোর, যুবক-যুবতীদের মনের কাছাকাছি অতিসহজে অবস্থান করতে পারতেন এবং একজন আদর্শ গঠনদাতা ও শিক্ষাদাতা হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে নিজেকে নিস্বার্থভাবে ব্যয়িত করেছেন। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তার ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তিনি নাচ, গান ও ধর্মীয় নাটকের মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন এবং এর মধ্যদিয়ে প্রভু যিশুর স্বর্গরাজ্য বিস্তারের কাজকে বিশেষভাবে ত্বরান্বিত করেছেন। সিস্টারের এ সকল দানের জন্য আমরা প্রভুর ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি।

আমাদের এসএমআরএ সংঘে আমরা এমনি একজন সেবিকাকে পেয়েছিলাম বলে সত্যিই পরম পিতার নিকট আজ কৃতজ্ঞ। প্রার্থনা করি পিতা যেন সিস্টারকে অনন্তধামে চিরশান্তি দান করেন এবং তার মধ্যদিয়ে আমাদের সংঘকেও আশীর্বাদিত করেন।

- এসএমআরএ সিস্টারগণ

বিজ্ঞ/১২৫/২১

চির শান্তি দাও প্রভু তাঁকে

প্রয়াত রুবেন গমেজ

জন্ম : ২১ এপ্রিল ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৯ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

আমাদের প্রিয় বাবা **মি. রুবেন** গমেজ ইন্দিরা রোডস্থ নিজ বাসায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে পরবর্তীতে দশদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থেকে ৮৭ বছর বয়সে মহাখালীস্থ ইমপালস্ হসপিটালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি পুরান তুইতাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী রেনু গমেজ ও তিন ছেলে, এক মেয়ে, মেয়ে জামাই, দুই পুত্রবধু, তিন নাতিসহ, ভাই-বোন ও অসংখ্য আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহীদের।

মি. রুবেন গমেজ তাঁর সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনে প্রথম ত্রিশ বছর বর্তমান বি.আই. ডব্লিউ. টি. সি. - এ অফিসার হিসেবে এবং পরবর্তীতে ১৯৮১ হতে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কারিতাস বাংলাদেশ এর খুলনার আঞ্চলিক পরিচালক ও কেন্দ্রিয় কল্যাণ পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন অফিসে খন্ডকালীন কাজ করেন। তিনি ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন সেন্ট গ্রেগরীজ কলেজ (পরবর্তীতে নটরডেম কলেজ) থেকে আইএ পাশ করেন। সংসারের প্রয়োজনে তিনি পড়াশুনার পাশাপাশি অফিসে কাজ করেন এবং ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে জগন্নাথ কলেজ হতে বিএ পাশ করেন।

তিনি দীর্ঘদিন সমাজ ও মন্ডলীর বিভিন্ন সেবা কাজে জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের একজন। ভিনসেন্ট ডি পল সমিতি, মন্ডলীর বিভিন্ন কমিশন, বিভিন্ন সমিতি, তুইতাল ধর্মপল্লীর বিভিন্ন কার্যক্রম, রাজাবাজার নতুন চ্যাপেল নির্মাণ কমিটি, সাধু পলের প্রচার সংঘ, ব্যাপ্টিষ্ট ও এ্যাংলিকান মন্ডলীর উন্নয়ন সংস্থাসহ বহু সংঘ সমিতির সাথে মৃত্যু পূর্ব পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন।

গত ১৯ এপ্রিল তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খ্রিস্টযাগে পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই, বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজসহ ১২ জন যাজক পৌরহিত্য করেন। লক-ডাউনের জন্য অনেকে উপস্থিত হতে না পারলেও কারিতাস বাংলাদেশের কেন্দ্রিয় অফিসের পরিচালকগণ, ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, ব্রতধারী-ব্রতধারিণীগণ, আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্খীগণ উপস্থিত হয়ে তাঁকে সমাহিত করেন। মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও খ্রিস্টযাগের পূর্বে প্রয়াত রুবেন গমেজ এর জন্য প্রার্থনা করেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খ্রিস্টযাগে আর্চবিশপ মহোদয় মি. রুবেন গমেজকে একজন ধার্মিক, নিষ্ঠাবান মানুষ ও সমাজ সংগঠক হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি একজন আদর্শ পিতা ও স্বামী হিসেবে এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য তার সেবা ও ভালবাসা দান করে গেছেন বলে উল্লেখ করেন। আর্চবিশপ মহোদয় শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

আমাদের বাবা রুবেন গমেজ ছিলেন একজন অমায়িক, পরোপকারী, কর্মঠ ও স্নেহপ্রবণ মানুষ। তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী, ধর্মভীরু ও মন্ডলী ও সমাজের একজন নীরব সেবাকর্মী ছিলেন। প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা, নিয়মিত রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতেন। প্রার্থনা করি আমরা যেন তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে পারি।

তাঁর অসুস্থতার সময় ও মৃত্যুর পর যারা প্রার্থনা করেছেন ও পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। পরম করুণাময় তাঁকে অনন্ত শান্তি দান করুন।

শোকাহত পরিবারের পক্ষে-

সহধর্মিনী : খ্রীষ্টিনা রেনু গমেজ
বড় ছেলে : ফাদার ডেভিড গমেজ
পুত্র ও পুত্রবধূগণ : জুলিয়ান - রোজমেরী, জর্জ - তপতী
কন্যা ও জামাতা : সিন্থিয়া-আন্তনী
আদরের নাতিগণ : জয়, এ্যালেক্স ও এ্যালেন।

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ১৫

THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 15

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ১৫

❖ 2 - 8 May, 2021, ১৯ - ২৫ বৈশাখ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

Regd. No. DA-33

BOOK POST

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

অজিত কুমার চাক্‌মা

জন্ম : ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ৫ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

একটি বছর পার হয়ে গেলো তুমি আমাদের ছেড়ে প্রভুর চরণে স্থান করে নিয়েছো। গত দুই বছরে Kidney Diolysis নিতে নিতে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলে: ৫ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সকালে একেবারেই চলে গেলে। বিকালে জানতে পারি তোমারও নাকি করোনা হয়েছিল।

পিতা ঈশ্বর তোমাকে অনন্ত শান্তি দান করুন। স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো।

তোমার আদরের মামনী : ভিক্টোরিয়া চাঁদনী চাক্‌মা
মেয়ে জামাই : মোশি সায়েন হালদার
নাতি : ইম্মানুয়েল মোজে হালদার (রৌদ্র)
স্ত্রী : করবী হালদার (চাক্‌মা)
ও
সকল আত্মীয় পরিজন

ঠিকানা : ক-১১৭/৯, দক্ষিণ মহাখালী
খ্রিস্টান পাড়া, ঢাকা-১২১৩

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত উষারাণী রোজারিও

জন্ম : ৪ নভেম্বর, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ২৬ এপ্রিল, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

প্রয়াত : স্বামী রেজিন্যাল্ড ডি'রোজারিও

ডাঙ্গীর বাড়ী, রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী
কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

একটি বৎসর পার হয়ে গেল 'মা' তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছো। আমাদের দশ ভাইবোনদের সর্বদা তোমার আঁচলে আগলে রেখেছিলে বুঝতে দাওনি প্রকৃত ভালবাসার অভাব। তোমাকে ঘিরে আমরা সব ভাই-বোন এক হতাম, কত আনন্দ করতাম তাই আজ, তোমার এই শূণ্যতা আমাদের হৃদয়ে বড় বাজে। বিশেষভাবে আমরা যারা তোমার খুব কাছাকাছি কিংবা সঙ্গে ছিলাম-ক্লান্ত হয়ে বাইরে কিংবা অফিস থেকে এসে যখন তোমার শান্ত হাসিমুখ খানা দেখতাম তখন বড় শান্তি পেতাম। তাই বুঝতে পারিনি আগে, তোমার নিরব উপস্থিতি এবং তোমার মধুর কণ্ঠস্বর সর্বদা আমাদের এক পবিত্র অদৃশ্য ভালবাসায় আবৃত করে রেখেছিলো। এখন আর কেউ নেই আমাদের মনের কথাগুলি শুনার এবং বিশ্বাস ভরা সান্ত্বনার বাণী শুনাবার। বড় বেশি আস্থা ছিল তোমার ঈশ্বরের উপর এবং সর্বদা আমাদের জন্য প্রার্থনা করতে, তাই তো আমরা ছিলাম নিরাপদ আশ্রয়ে। এখন বড় ভয় হয় 'মা' ভীষণ অসহায় হয়ে গেলাম আমরা। হৃদয় গহীনে তোমার শূণ্যতা গুমড়ে-গুমড়ে কাঁদছে চোখে আমাদের কারো জল নেই। কিন্তু এক চাপা ব্যথায় আমাদের হৃদয় সর্বদা কাঁদছে এবং সর্বদা যন্ত্রণা দিচ্ছে। তাই তো আমরা মানসিকভাবে খুবই দুর্বল হয়ে গেছি 'মা'। বর্তমান এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আমরা আরো ভীত! তুমি এবং বাবা স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো এবং যত্ন নাও, সান্ত্বনা দাও যে বর্তমান এই পরিস্থিতিতে ঈশ্বরকে গভীরভাবে আঁকড়ে ধরে, সৎভাবে জীবনপথে এগিয়ে যেতে পারি তোমার কাছে আমরা এই প্রার্থনা করি।

শোকসন্তপ্ত পরিবার

মেয়ে ও মেয়ে জামাই : চিত্রা-প্রেমন্ত, জয়ন্তি-নবীন, সিস্টার শিল্পী সিএসসি নিভতি, সিস্টার পূর্ণা এসএমআরএ, ঋতু-সাগর
ছেলে ও ছেলে বৌ : মিন্টু-মালা, আশীষ-কবিতা, স্বপন, মিথেল রোজারিও
নাতি ও নাতি বৌ : রূপম-এ্যানি, রেমি-অতশি, অর্ণব, কাজল, মানি
নাতনী ও নাতনী জামাই : রেশমী-বিকাশ, এলিস
পুতিন : ইভান, চেইজ, রঞ্জন ও ঈশান।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com,** Web: weekly.pratibeshi.org

সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
২ - ৮ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
১ মে বিশ্ব শ্রমিক দিবস
ঐশ আজ্ঞা পালনে চির বিশ্বস্ত নীরব কর্মী সাধু যোসেফ
করোনাকালে কর্মহীন কর্মীদের করুণ কাহিনী
উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এবং রূপকল্প ২০৪১

তোমরা অমর

ছফিয়া (ছফি) গমেজ
জন্ম : ১৭ মার্চ, ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৪ এপ্রিল, ২০০৭ খ্রিস্টাব্দ
উলুখোলা, মঠবাড়ী ধর্মপল্লী

তোমরা যে সত্যিই পৃথিবীর মায়ার বাঁধন ছিঁড়ে চলে গেছো স্বর্গের অনন্ত যাত্রায় এ চিরন্তন সত্যটি আমাদের মেনে নিতে খুবই কষ্ট হয়। তোমরা ছিলে আমাদের ঈশ্বরের পথ দেখানো আদর্শ বাবা-মা। তোমাদের আদর্শেই আমরা আজ চলছি ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভের প্রত্যাশায়। আজ কৃতজ্ঞচিত্তে, শ্রদ্ধাভরে ও নতশিরে তোমাদের জানাই হাজারো প্রণাম। তোমাদের প্রার্থনাপূর্ণ, সেবাপরায়ণ পবিত্র জীবনযাপনের কথা এখনো পাড়া-প্রতিবেশীরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে।

প্রার্থনা করি দয়াময় প্রভু পরমেশ্বরের কাছে, যতদিন আমরা এ ধরণীতে আছি ততদিন যেন, তোমাদের আদর্শ-ভালবাসা ও ক্ষমার বাণী হৃদয়ে ধারণ করে যেতে পারি। ঈশ্বর তোমাদের অনন্ত শান্তি দান করুন।

রেজিন গমেজ
জন্ম : ২৪ ডিসেম্বর, ১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৯ এপ্রিল, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ
উলুখোলা, মঠবাড়ী ধর্মপল্লী

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে,

মেয়ে ও মেয়ে জামাই : প্রয়াত মঞ্জু রোজমেরী - জ্যোতি গমেজ
ছোট মেয়ে : সিস্টার মেরী আরতি, এসএমআরএ
নাতি-নাতি বৌ : মানিক-সারা গমেজ
নাতী-নাতীন জামাই : শিল্পা-সুবাস গমেজ, অসীম-মুক্তা গমেজ, হীরা-বিকাশ রোজারিও
পুতি-পুতিন : শুভ্র, জেনিফার, মাধিন্তা, সাইনী, এঞ্জেলি ও শুভন
উলুখোলা, মঠবাড়ী ধর্মপল্লী

বাবার চির বিদায়ের তৃতীয় বার্ষিকী

প্রয়াত এডুয়ার্ড সুবল কস্তা
জন্ম : ২৯ অক্টোবর, ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দ
মৃত্যু : ৪ মে, ২০১৮ খ্রিষ্টাব্দ
চড়াখোলা (আইলসা বাড়ি)
তুমিলিয়া ধর্মপল্লী

প্রিয় বাবা,

নিয়তির বর্ষ পরিক্রমায় তোমার চির বিদায়ের তৃতীয় বছরটি অতিক্রান্তের পথে। তোমার এই চির বিদায় আমাদের অন্তরে আরো গভীর অনুভবে নাড়া দিয়ে তোমাকে বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়। বাবা আমাদের হৃদয়ে তোমাকে বারবার স্মরণতো হবেই বাবা। তুমি যে আমাদের পরম মমতায় আগলে রেখেছিলে। বটবৃক্ষের ছায়া হয়ে থাকতে। আজ তোমার ভালবাসার স্ত্রী, আমাদের মা আগলে রেখেছেন তোমার ছায়া হয়ে। তোমার হঠাৎ এভাবে চলে যাওয়া আমরা মেনে নিতে পারিনি বাবা। তবুও ঈশ্বরের ইচ্ছাকে আমরা বিশ্বাসপূর্ণ শ্রদ্ধা জানাই এবং বিশ্বাস করি ঈশ্বর তোমাকে স্বর্গের অনন্তলোকে স্থান দিয়েছেন।

বাবা, আমাদের জন্য ঈশ্বরের বিশেষ আশীর্বাদ বর্ষিত করো যেন তোমার অপরিসীম ভাল গুণাবলীগুলো আমাদের জীবন চলার পথে আঁকড়ে ধরে চলতে পারি।

তোমারই সংসারের শোকার্ত প্রিয়জন -

স্ত্রী : দীপ্তি ক্লারা কস্তা
মেয়ে- মেয়ে জামাই : মুক্তা-সত্যেন (আমেরিকা), শিলা-সোনালী (তেজগাঁও)
ছেলে- ছেলে বউ : চন্দন-জুঁই, চয়ন-রজনী (হেজলী)
নাতি-নাতি বউ : টিটো- ভেরোনিকা, রিমন, তুর্য ও জীর্ণ
নাতিন-জামাই : লাবিন্যা-রবি, চৌয়া ও রুমন
পুতিন : নিয়োনা

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

বর্ষ : ৮১, সংখ্যা : ১৫
২ - ৮ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ
১৯ - ২৫ বৈশাখ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড
ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়
সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা
ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি
সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন
মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স
দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক
চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫
E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

কর্ম ও কর্মীর প্রতি মনোযোগ আবশ্যক

কর্ম বা শ্রমজীবী মানুষের প্রতি সম্মান-শ্রদ্ধা জানিয়ে পহেলা মে আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস পালন করা হয়। বিশ্বের মেহনতি মানুষ বিশেষভাবে নিম্ন আয়ের শ্রমিক, গৃহকর্মী ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষ যেন তাদের মৌলিক অধিকার ও মানবিক মর্যাদা নিয়ে বেঁচে থাকে, জীবনকে উপভোগ করতে পারে এমনটি প্রত্যাশা করেই সারাবিশ্বে শ্রমিক দিবস পালন করা হয়। শ্রমিকেরা প্রতিদিন হাড়ভাঙ্গা খেটে এ বিশ্বকে সচল ও সতেজ রেখেছেন। সুন্দর ও উন্নত বিশ্ব গড়তে এদের ভূমিকাই প্রধান। কিন্তু দূর্ভাগ্যক্রমে বিশ্বের অনেক স্থানে এই শ্রমিকেরাই শোষণ, নিপীড়ণ ও বঞ্চনার শিকার হয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। বিভিন্ন ছলাকলায় ও কূটকৌশলে সহজ-সরল শ্রমিকদের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করছে শিক্ষিত মালিকশ্রেণীর মানুষেরা। অনেক সময়ই মালিকপক্ষ কর্মীদেরকে নিজেদের বিত্ত-বৈভব বাড়ানোর মেশিন হিসেবে বিবেচনা করেন। ফলশ্রুতিতে কর্মীদেরকে প্রয়োজন-অপ্রয়োজনে বিভিন্নভাবে খাটিয়ে তাদের কাজটা হাসিল করে নেয়। এ অতিরিক্ত কাজ আদায় করতে তারা কর্মীদেরকে বিভিন্ন সুবিধা দেবার কথা বলে। কিন্তু বাস্তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মালিকপক্ষ তাদের কথা রাখেন না। কর্মীদের প্রয়োজন ও চাহিদার দিকে তেমন একটা নজর দেন না।এমনকি শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা বা নিরাপদ কর্মপরিবেশও দান করেন না। মনে হয় মালিকদের কাছে কাজটাই বড় মানুষটি নয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, একজন শ্রমিক সেও মানুষ। তারও আত্মসম্মানবোধ আছে। তার ন্যায্য অধিকার তাকে দিতে হবে। কর্মের ধরণে বিভাজন থাকাটা স্বাভাবিক কিন্তু প্রত্যেকজন শ্রমিককে শ্রমের যথার্থ মর্যাদা দানে যেন কোন কৃপণতা না থাকে।

কর্মী মর্যাদাবান হতে পারেন তার কর্ম করার মধ্যদিয়ে। যে কাজই হোক না কেন তা দরদ ও ভালবাসা দিয়ে করে প্রতিটি কাজের মাহাত্ম্য তুলে ধরা যায়। কর্মীকে তার সুনির্দিষ্ট কাজ ভালো মতো সম্পন্ন করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। কাজটিকে জীবনাহ্বানের মতো গ্রহণ করতে হবে। দায়সারাভাবে কোন কাজ করলে কাজের সৌন্দর্য ফুটে উঠে না। তাই কর্মের প্রতি প্রত্যেক কর্মীকেই মনোযোগী, বিশ্বস্থ ও তৎপর হতে হবে।

বাংলাদেশের রফতানি আয়ের প্রধান খাত তৈরি পোশাক খাত এবং এরপরেই প্রবাসী শ্রমিক। যারা দেশকে স্বনির্ভর ও অর্থনৈতিকভাবে উন্নত করতে কঠোর পরিশ্রম করছে, সেই শ্রমিকদেরকে আমরা কতটা সম্মানের চোখে দেখি! বর্তমানে দেশে-বিদেশে করোনা পরিস্থিতির শিকার হচ্ছেন শ্রমিকরা। অভিবাসন খাতে এরই মধ্যে কাজ হারিয়েছেন আট লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার শ্রমিক। তারা অনেকে দেশে ফিরে এসেছেন; ফেরার অপেক্ষায় রয়েছে আরো অনেকে। যারা ছুটিতে এসেছিলেন তারাও ফিরতে পারছেন না বিভিন্ন জটিলতার কারণে। প্রথম দফা লকডাউনের প্রকোপ একটু কমার পর কেউ-কেউ কাজে যোগ দিলেও পরিস্থিতি আবার সংকটময় হচ্ছে। করোনাপরবর্তী কেমন ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে তাদের জন্য? ইতোমধ্যেই অনেক শিল্প কারখানা থেকে হাজারো-হাজারো শ্রমিক ছাঁটাই করা হচ্ছে। করোনা পরবর্তী সময়ে শ্রমিকদের প্রতি কেমন আচরণ হবে মালিক পক্ষের বিষয়টি এখনই ভাবাচ্ছে? কাজ না থাকায় মালিকপক্ষেরও উপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে গেছে। এমনিতর অবস্থায় কর্মীকে কর্মের প্রতি ও মালিককে কর্মীর প্রতি মনোযোগী হতে হবে। উভয়পক্ষের মধ্যে সুসম্পর্ক থাকলে এই কালবেলা অতিক্রম করা সম্ভব। নিয়ন্ত্রিত কিন্তু কঠিন পরিশ্রম এবং মালিক-কর্মীর পারস্পরিক হৃদ্যতাপূর্ণ শ্রদ্ধাবোধ প্রতিষ্ঠিত হলে একটি মানবিক সমাজ সৃষ্টি হবে। যে মানবিক সমাজে সকলে একসাথে প্রতিকূলতাকে জয় করতে সক্ষম হবে।

সমাজ, দেশ ও মণ্ডলী গঠনে সবার শ্রমই প্রয়োজন। শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা ভরে স্মরণ করি দেশ ও জাতির জন্য শ্রমিকদের সকল অবদান। দেশের ও প্রবাসের সকল শ্রমজীবী মানুষ নিরাপদে ও শান্তিতে থাকুক। শ্রমিকদের প্রতিপালক সাধু যোসেফ তাদের মঙ্গল করুন। †

আর এই তো তাঁর আজ্ঞা : আমরা যেন তাঁর পুত্র যিশু খ্রিস্টের নামে বিশ্বাস রাখি ও পরস্পরকে ভালবাসি, তিনি যেমন আমাদেরকে আজ্ঞা দিয়েছেন। *- (১ম যোহন ৩:২৩)*

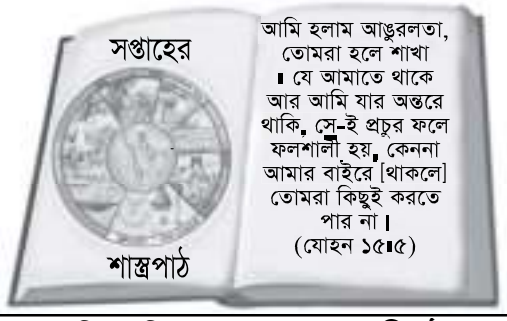

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৫ এপ্রিল - ০১ মে, ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

২ মে, রবিবার
শিষ্যচরিত ৯: ২৬-৩১, সাম ২২: ২৬খ-২৮, ৩০-৩২, ১ যোহন ৩: ১৮-২৪, যোহন ১৫: ১-৮

৩ মে, সোমবার
১ করি ১৫: ১-৮, সাম ১৯: ১-৪, যোহন ১৪: ৬-১৪

৪ মে, মঙ্গলবার
শিষ্যচরিত ১৪: ১৯-২৮, সাম ১৪৫: ১০-১৩কখ, ২১, যোহন ১৪: ২৭-৩১ক

৫ মে, বুধবার
শিষ্যচরিত ১৫: ১-৬, সাম ১২২: ১-৫, যোহন ১৫: ১-৮

৬ মে, বৃহস্পতিবার
শিষ্যচরিত ১৫: ৭-২১, সাম ৯৬: ১-৩, ১০, যোহন ১৫: ৯-১১
আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি, ক্রুজ, ওএমআই-এর বিশপীয় অভিষেক বার্ষিকী।

৭ মে, শুক্রবার
শিষ্যচরিত ১৫: ২২-৩১, সাম ৫৭: ৭-১১, যোহন ১৫: ১২-১৭

৮ মে, শনিবার
শিষ্যচরিত ১৬: ১-১০, সাম ১০০: ১-৩, ৫, যোহন ১৫: ১৮-২১

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২ মে, রবিবার
+ ১৯৪৫ ফাদার বি. ভালেন্টিনো বেলজেরি (দিনাজপুর)
+ ১৯৪৬ সিস্টার ইউলালি সিএসসি

৩ মে, সোমবার
+ ১৯০৫ সিস্টার ভিনসেন্ট এসএসএমআই (ময়মনসিংহ)
+ ১৯৬৬ ফাদার জেমস মেকগার্ভি সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯২ ব্রাদার জুড কস্তেল্ল সিএসসি (ঢাকা)
+ ১৯৯৭ ফাদার পল গমেজ (ঢাকা)
+ ২০০৮ ফাদার বারট্রেম নেলসন সিএসসি (চট্টগ্রাম)

৪ মে, মঙ্গলবার
+ ১৯৭০ সিস্টার লাওরা থিভার্জ সিএসসি
+ ১৯৯৬ ফাদার বেল্লিনী লুইজি পিমে (দিনাজপুর)

৫ মে, বুধবার
+ ১৯৭১ সিস্টার লিলিয়ান ব্রোনেল সিএসসি (চট্টগ্রাম)
+ ২০১৫ সিস্টার যোসেফিন হাঁসদা সিআইসি (দিনাজপুর)

৬ মে, বৃহস্পতিবার
+ ১৯৯৭ সি. বার্থোলমেয় হালদার এসসি (খুলনা)

৮ মে, শনিবার
+ ২০১৬ ব্রাদার জারলাথ ডি' সুজা সিএসসি (ঢাকা)

মাস্ক পড়া কথা

গত ২৪-৩০ জানুয়ারি ২০২১ খ্রিস্টাব্দ। সাপ্তাহিক প্রতিবেশীর পত্রবিতানে দিলীপ ভিনসেন্ট গমেজের লিখিত "আসুন মাস্ক পড়ি" লেখাটা যেমন প্রয়োজনীয়, তেমন গুরুত্বপূর্ণও বটে। তিনি এই করোনা ভাইরাস মহামারি কালে, করোনাভাইরাস প্রতিরোধে মাস্ক পড়া নিয়ে যেসব বিষয়বস্তু লেখায় তুলে ধরেছেন তা অত্যন্ত প্রশংসনীয় বিষয়। তাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। তবে মাস্ক এর প্রধান বিষয়, মাস্ক, কখন, কোথায় এবং কিভাবে পড়তে হবে, কিভাবে ব্যবহার করতে হবে তা জানতে হবে। মাস্ক এমন একটি বস্তু, খাবার ছাড়া যেমন জীবন বাঁচে না, তেমন মাস্ক ছাড়া করোনাভাইরাসও বিদায় হয় না।

আমি মাস্ক পড়া নিয়ে এমন একটি সত্য ঘটনার কথা বলতে চাই, আশা রাখি তাতে ছোট-বড় সবারই কল্যাণে আসবে। আমি কিছুদিন আগে সকালে আমার বাড়ির সামনে খালপাড়ের রাস্তা দিয়ে হাটছিলাম। তখন আমার পরিচিত একজন বৃদ্ধ মুসলিম ভাই হেটে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, আসালামু আলাইকুম মাস্টার। আমিও বললাম, ওয়ালাইকুম সালাম ভাই। আমি হাটছিলাম শারীরিক ব্যায়ামের জন্য, আর মুসলিম ভাই হাটছিলেন বহুমূত্র রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য। মুসলিম ভাই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, মাস্টার আপনার মাস্ক কোথায়? আমি কোনো উত্তর না দিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, আগে বলুন আপনার মাস্ক কোথায়? উত্তর পেলাম, কেন? কানা হয়ে গেলেন নাকি? আমার মাস্ক কোথায় আপনি কি তা দেখতে পাচ্ছেন না? বললাম, ভাই এ বৃদ্ধ বয়সে কানা-কানা ভাবতো হবারই কথা, তবু আমি দেখছি, আপনার মাস্ক নাকেও না, আবার মুখেও না, মাস্ক দেখছি আপনার থোতায়। আপনি কি জানেন না, করোনাভাইরাস থোতা, মাথা আর কপাল দিয়ে শরীরে প্রবেশ করে না, প্রবেশ করে নাক মুখ দিয়ে। এভাবে আপনার মাস্ক পড়া আর আমার মাস্ক না পড়াও একই কথা। এবার বুঝলেন? এরপর মুসলিম ভাই মাস্ক টেনে নাক-মুখ ঢেকে চলে গেলেন। শ্রদ্ধেয় - শ্রদ্ধেয়া পাঠক-পাঠিকাবৃন্দ, আমাদের অনেকেরই প্রবণতা, নিজের দোষ চিন্তা না করে অন্যের দোষ খুঁজে বের করা। পবিত্র বাইবেলে যিশুর কথা লেখা, প্রথমে নিজের চোখের কড়িকাঠ বের কর, তাহলে অন্যের চোখের কড়িকাঠ দেখতে পাবে। আসুন আমরা সবাই মাস্ক পড়ি, করোনাভাইরাস প্রতিরোধে সাহায্য করি॥

মাস্টার সুবল

অভিষেক বার্ষিকীতে অভিনন্দন

৬ মে, ২০০৫ ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ বিজয় এন ডি'ক্রুজ ওএমআই-এর পদাভিষেক বার্ষিকী। ২০০৫ খ্রিস্টাব্দের ৬ মে তিনি বিশপ পদে অভিষিক্ত হয়েছে। "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র" ও "সাপ্তাহিক প্রতিবেশী"র সকল কর্মী, পাঠক-পাঠিকা এবং শুভানুধ্যায়ীদের পক্ষ থেকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুন্দর জীবন কামনা করি।

- সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

করোনাকালে কর্মহীন কর্মীদের করুণ কাহিনী

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

করোনাভাইরাসের আক্রমনের স্থায়িত্ব এতটা দীর্ঘস্থায়ী হবে তা আমাদের দেশের বেশিরভাগ মানুষই হয়তো ভাবেনি; কমপক্ষে আমরা কেউ প্রত্যাশা করিনি। কিন্তু ভাবনার ঊর্ধ্বে উঠে করোনাভাইরাস তার দাপট দেখিয়ে যাচ্ছে সগৌরবে অত্যন্ত ভয়ঙ্করভাবে। করোনায় স্বাস্থ্য ও জীবনহানির যেমনি ঝুঁকি রয়েছে ঠিক তেমনি জীবিকা হারানোর ঝুঁকিও রয়েছে। যা ইতোমধ্যে আমাদের দেশেও দৃশ্যমান হয়েছে। বাংলাদেশের সাতষট্টি লাখের বেশি শ্রমিক পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কাজ করছেন। এরমধ্যে আট লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার শ্রমিক কাজ হারিয়ে দেশে ফেরত এসেছেন এবং অনেকে ফেরার প্রতিক্ষায় রয়েছেন। দেশের অভ্যন্তরেও হাজার হাজার মানুষ কর্মহীন হয়ে বেকার জীবন কাটাচ্ছেন অনেকদিন ধরে। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও কাজে যোগ দিতে পারছেন না অনেকেই। মানুষের জীবন-যাত্রা স্তবির হয়ে যাওয়াতে অনেক ছোট-ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেছে। তাই করোনা মহামারী শুধু মানুষের জীবন ও স্বাস্থ্য নয়, তাদের জীবিকার উপরও থাবা বসিয়েছে। আইএলওর মহাপরিচালক গত বছরই বলেছিলেন, করোনাভাইরাস এখন আর শুধুমাত্র স্বাস্থ্য সংকট নয়। এটি শ্রম ও অর্থনৈতিক বড় সংকটও।

আমরা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও মিডিয়াতে দেখেছি করোনার কারণে অনানুষ্ঠানিক (ইনফরমাল) অনেক শ্রমিকেরা চাকুরিচ্যুত হয়েছেন। গার্মেন্টস, ব্যাংক, ইন্স্যুরেন্স ও সরকারী কাজ - এই চারটি খাত ছাড়া বাকি সবই অনানুষ্ঠানিক খাত। সঙ্গত কারণে দেশের বেশিরভাগ শ্রমজীবী কর্মহীনতা অভিজ্ঞতা করছেন এবং দারিদ্রে পতিত হচ্ছেন। প্রবাসী কর্মী, বিভিন্ন বাসাবাড়িতে কাজ, হোটেল-রেস্টুরেন্টে, প্রসাধন-বিনোদন সেবাকর্মী, দিনমজুর, হকার, পরিবহন শ্রমিক, রিক্সা-টেম্পু-সিএনজি, উবার চালক, দর্জি, নাপিত - এ ধরণের বিভিন্ন পেশার বিপুল সংখ্যক মানুষ কর্মহীন। কিন্তু তাদের পরিবারের খরচতো আর বন্ধ হয়নি। করোনা সংক্রমন রোধে দীর্ঘদিন লকডাউন দেওয়ায় তাদের অবস্থা করুণ থেকে করুণতর হচ্ছে। কাজ করতে চেয়েও করতে না পারা এবং সন্তান, পরিবার-পরিজনের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে না দেবার কি যে কষ্ট তা ভুক্তভোগী ছাড়া কেউ বুঝতে পারবে না। করোনার ১ম ও ২য় উভয় ঢেউয়ের সময়েই আমি কর্মহীন কষ্টগাঁথা দেখেছি। করোনাকালে আমার আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্খীরা সতর্ক করতেন যাতে বাইরে বের না হয়, ঘরে থেকেই যতটা কাজ করা যায়। কিন্তু দায়িত্বের কারণে, করোনাকালে মানুষের কষ্ট অনুধাবন করতে মনের টানে প্রায়ই বের হয়ে যেতাম। পথে ঘাটে দেখেছি কর্মঠ মানুষের কাজ না পাওয়াতে বিরস বদন, শূণ্য ফুটপাতে হকারদের উদাসীন দৃষ্টি। শুনেছি কাল কি খবো জানি না, সাহায্য চাইতেও পারছি না আবার খাবারও যোগার করতে পারছি না, অসুখ হলে চিকিৎসা যে করাবো তার কোন সামর্থ্য নেই। ঈশ্বরের কাছে আহাজারি করে বলছেন, ঈশ্বর এই সময়ে যেন অসুখে না পরি ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঘটনা -১: রিপ্পী ও রোদেলা স্বামী-স্ত্রী; উভয়েই ছোট-খাট কাজ করে সংসার চালায়। স্বামী রেস্টুরেন্টে কাজ করে এবং স্ত্রী মহিলাদের কাপড়-প্রসাধনী বিক্রি করে কিছু আয় করে। ২০২০ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাস থেকেই স্বামীর চাকুরি নেই এবং স্ত্রীও তেমন কোন অর্ডার পাচ্ছে না। ছেলে-মেয়ের পড়াশুনার কথা চিন্তা করে গ্রামের বাড়িতেও যেতে পারছেন না। কিন্তু বাড়িভাড়া দিতেও হিমশিম খাচ্ছেন। অবস্থা একটু ভালো হলে রিপ্পী অনেকস্থানে ঘুরেও কোন কাজের ব্যবস্থা করতে পারছে না। এমনি সময় আবার সবকিছু বন্ধ। খাওয়া ও পোষাক-আশাকের জৌলুস কমিয়ে কোনরকমে এক বছর ম্যানেজ করেছে। বাড়ন্ত বয়সের দুই ছেলেমেয়ে পর্যাপ্ত খাদ্য না পেয়ে কেমন যে নেতিয়ে পরছে। গ্রামের বাড়িতেও বাড়ি ছাড়া আর কিছু নেই। কি করবে রিপ্পী-রোদেলা বুঝতে পারছে না।

ঘটনা- ২: একজন ফাদার সহভাগিতা করে বলছিলেন, তার গ্রামের অনেক মানুষ মধ্যপ্রাচ্যে কাজ করেন। প্রত্যেক জনের পরিবারেই স্বাভাবিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ছিল। করোনার প্রাথমিক ধাক্কা প্রথমদিকে তাদেরকে খুব একটা স্পর্শ করতে পারেনি। ভেবেছিল করোনা কেটে গেলে শিঘ্রই বিদেশে ফেরত যাবে এবং স্বাভাবিক জীবন ফিরে আসবে। তাই তারা তাদের জমানো টাকা খরচ করে পরিবার পরিজন নিয়ে খেয়ে-দেয়ে আরামেই কাটাচ্ছিল। খাওয়া-দাওয়া ও ঘুরাফেরায় অনেক টাকা খরচ করে ফেলায় ৫/৬ মাস পরে কপালে কিছু চিন্তার ভাজ পড়ে। কর্মক্ষেত্রে যোগাযোগ করলেও শুধু অপেক্ষা করতে বলে। দিন গিয়ে মাস গেলেও কাজে যোগ দিতে পারছেন না। পরিবারে আর কোন কর্মক্ষম ব্যক্তি না থাকায় আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে ধার-দেনা করে চলতে থাকেন। ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার খরচ চালাতেও হিমশিম খাচ্ছে। মরার ওপর খাড়ার ঘা হয়ে স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। করোনা ঢেউ এর কারণে হাসপাতালগুলোতে ভর্তি করা যাচ্ছে না আবার প্রাইভেট ক্লিনিকে চিকিৎসা চালানোও প্রচুর ব্যয়সাধ্য। মিশনের ঋণদান সমবায় সমিতিতে লোন করে টাকা তুলে স্ত্রীর চিকিৎসা করিয়ে যে টাকা ছিল তা দিয়ে দু'মাস চলছে। এখন সংসার চালানোর মতো অর্থও তার নেই। জমি বা স্ত্রীর সোনার গহনা বিক্রি করা ছাড়া তার কোন উপায় নেই। কিন্তু এ দুটোও কেউ ন্যায্য মূল্যে এখন কিনতে চাচ্ছে না। তাই উপান্তর না পেয়ে সমস্ত দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে তিনি ফাদারের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করছেন। ফাদার জানালেন, ঐ লোকই শুধু নয় এ ধরণের আরো ৭/৮জন তাকে অনুরোধ করেছে কিছুটা সাহায্য করতে। ফাদারের মুখাবয়বে তাকিয়ে বুঝলাম তিনি ঐ লোকদের করুণ আর্তি হৃদয়াঙ্গম করেছেন। মুখ নামিয়ে ক্ষীণ স্বরে বললেন, সবাইকে সাহায্য করার সামর্থ্য তো আমার নেই। অদেখা সেই হাজারো প্রবাসী কর্মী যারা দেশে এসে কর্মহীন হয়ে পড়েছে তাদের করুণ চাহনি আমার মানসপটে ভেসে ওঠছে আর কষ্ট দিয়ে যাচ্ছে।

ঘটনা-৩: ২৭ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দে দ্য ডেইলী স্টার অনলাইন পত্রিকায় প্রকাশ, গত ৫ এপ্রিল থেকে করোনা সংক্রমন রোধে সারাদেশে গণপরিবহন বন্ধ ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে প্রায় ৫০ লাখ সড়ক পরিবহন শ্রমিক কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। তাদের বেঁচে থাকার মতো অবলম্বন নেই। উপার্জনের পথ বন্ধ থাকায় পরিবহন শ্রমিকেরা পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছেন। পরিবার-পরিজন নিয়ে অর্ধাহারে-অনাহারে থাকার যন্ত্রণা পরিবহন শ্রমিকদের কাছে করোনা সংক্রমনের ভয়ের চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে। কিছুদিন আগে প্রথম আলোর এক প্রতিবেদনে বলা হয়, সদরঘাটে লঞ্চ চলাচল না করায় সেখানকার ভাসমান হকার ও মুটেরা একবেলা খেয়ে দিন পার করছে।

এমনিভাবে আরো শত-শত করুণ কাহিনী তুলে ধরা সম্ভব। কিন্তু করোনা যেন আমাদেরকে করুণ করে দিতে না পারে সেজন্য আমাদেরকে পদক্ষেপ নিতে হবে। তাৎক্ষণিক সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য সরকারসহ বিত্তবানদের এগিয়ে আসতে হবে কর্মহীন মানুষকে খাদ্য সহায়তা ও নগদ অর্থ অনুদানের ব্যবস্থা করে দিয়ে সর্বস্তরের মানুষজনকে স্বাস্থ্যঝুঁকি সম্বন্ধে সচেতন হতে হবে। একা আমরা কেউ নিরাপদ নই, সকলে মিলেই নিরাপত্তা বলয় তৈরি করবো- এ মনোভাব দৃঢ় করতে হবে। ভোগ-বিলাসিতা কমিয়ে প্রকৃতির যত্ন নিয়ে করোনাভাইরাস মোকাবেলায় আমরা প্রত্যেকেই সক্রিয় যোদ্ধা হতে পারি ॥

ঐশ আজ্ঞা পালনে চিরবিশ্বস্ত নীরব কর্মী সাধু যোসেফ

রনেশ রবার্ট জেত্রা

ঈশ্বর ভালোবাসাময় এবং ক্ষমাশীল পিতা। তাই তিনি আমাদেরকে পাপ থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা করেছেন। সেই পরিত্রাণের মহাপরিকল্পনা তিনি তাঁর একমাত্র পুত্র যিশু খ্রিস্টকে দিয়ে বাস্তবায়িত করেছেন এবং এই মর্ত্যজগতে তিনি সাধু যোসেফ ও মা-মারিয়াকে তাঁর পরিত্রাণের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের অংশী করে তুলেছেন। তাঁদেরকেই তিনি এ কাজে বেছে নিলেন। তাঁরাও ঈশ্বরের ইচ্ছাকে মাথা পেতে মেনে নিলেন।

পবিত্র বাইবেলে মারিয়া সম্পর্কে যতটুকু লেখা রয়েছে, সাধু যোসেফের বিষয়ে তেমন কিছু লেখা পাওয়া যায় না। তাই বাইবেলে সাধু যোসেফের কোনো একটি মুখের ভাষ্যও শোনা যায় না। তবে তাঁর সম্পর্কে যতটুকু বলা হয়েছে তা থেকে বিশ্লেষণ করে প্রমাণীত এবং স্বীকার করে নিতে হয় যে, মানব মুক্তির ইতিহাসে সাধু যোসেফের ভূমিকা অসামান্য। কারণ, তিনি যদি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে গ্রহণ না করতেন তাহলে হয়তো মুক্তির ইতিহাসের মোড় ঘুরে যেতে পারতো। সাধু যোসেফ তাঁর জীবনের স্বাধীনতাকে ঈশ্বরের ইচ্ছার কাছে বিসর্জন দিয়েছেন।

রোমান দার্শনিক সেনেকা বলেছেন, "যিনি ঈশ্বরের বাধ্য হন, তিনিই স্বাধীন।" সেক্ষেত্রে সাধু যোসেফ প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন মানুষ ছিলেন। কারণ, তিনি সারাজীবন ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে চির বিশ্বস্থ এবং বাধ্য ছিলেন। কোনো জায়গায় লেখা পাওয়া যায় না যে, তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছা বা আজ্ঞা অগ্রাহ্য করেছেন। আমরা সাধু মথির লেখা মঙ্গলসমাচারে দৃষ্টিপাত করলে তার প্রমাণ পেতে পারি। সাধু মথির লেখা মঙ্গলসমাচারে (১:১৯) পদে সাধু যোসেফকে একজন ধর্মনিষ্ট মানুষ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। সত্যিকার অর্থেই তিনি ধর্মনিষ্ঠ মানুষ ছিলেন। তাঁর জীবনকর্মে আমরা তার প্রমাণ পাই যে, তিনি তাঁর জীবন ও কাজে ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে পিতা ঈশ্বরের ধার্মিকতার সব দাবি পূরণ করেছেন। সাধু যোসেফের প্রতি স্বর্গদূতের মধ্যদিয়ে ঈশ্বর যা করতে আজ্ঞা দিয়েছিলেন তা তিনি বিশ্বস্তভাবে এবং নীরবতায় পালন করেছেন। ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে তিনি কোনো অজুহাত দেখাননি *(মথি ১:২০-২৫)*। জীবন বাস্তবতায় দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায় যে, কোনো কাজ বা দায়িত্ব নিজের পছন্দ এবং স্বার্থসিদ্ধি হাসিল করার সম্ভাবনা না থাকলে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষের কাছে এবং যারা আমাদের দায়িত্ব দিয়ে থাকেন, তাদের কাছে আমরা অনেক সময় অজুহাত এবং শর্ত দিয়ে বসি যে, কাজটি করলে বিনিময়ে আমি কি পাব কিংবা আমি কাজটা করলে আমার কি লাভ হবে? অথচ সাধু যোসেফের জন্য ঈশ্বরের দেওয়া কাজটি কত যে কঠিন ছিল, তা অভিজ্ঞতা না করলে বুঝা যায় না। তবুও তিনি তা নীরবে মাথা পেতে নিয়েছেন এবং তা বিশ্বস্তভাবে পালন করেছেন।

সাধু মথি রচিত মঙ্গলসমাচারে *(২:১৩-১৫)* দেখতে পাই যে, সাধু যোসেফ স্বর্গদূতের নির্দেশে শিশু যিশুকে রাজা হেরোদের হাত থেকে প্রাণে বাঁচানোর জন্য মিশর দেশে রাতের বেলা পালিয়ে গিয়েছিলেন। ধারণা করা হয় যে, বেথলেহেম থেকে মিশর দেশের দূরত্ব ছিল প্রায় ৬৯০কি.মি.। পথগুলোও ছিলো পাহাড়ি দুর্গম এবং মরুপ্রান্তর। সেই পথ অতিক্রম করেই সাধু যোসেফ মিশর থেকে নাজারেথে আবার প্রত্যাবর্তন হয়েছিলেন *(মথি ২:১৯-২৩)*। সেখানেও তিনি কোনো কথা অর্থাৎ,বিনা বাক্য ব্যয়ে নীরবেই ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করেছেন। তিনি যে, প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরের আজ্ঞা পালনে চিরবিশ্বস্ত এবং নীরব কর্মী ছিলেন তা আমরা তাঁর কর্মের মধ্য দিয়ে বুঝতে পারি।

"ও কি সেই ছুতোরের ছেলে নয়? *(মথি ১৩:৫৫)* বাইবেলের এই উক্তিটির মধ্যদিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে, সাধু যোসেফ পেশায় ছিলেন একজন কাঠ মিস্ত্রী (ছুতোর এর অর্থ কাঠ মিস্ত্রী)। যে পেশাকে তৎকালীন ইহুদী সমাজে নগন্য কাজ হিসেবে দেখা হতো। কিন্তু সাধু যোসেফ সেই নগন্য কাজটিই বিশ্বস্থতার সাথে করেছেন। এভাবে তিনি তাঁর ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কাজগুলো নীরবে এবং বিশ্বস্থভাবে করে আজ মণ্ডলীতে আমাদের কাছে আদর্শ হিসেবে স্মরণীয় হয়ে আছেন। প্রকৃতপক্ষে, স্মরণীয় হয়ে থাকতে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে তা মানুষের কাছে প্রচার করতে হয় না, বরং আমাদের করণীয় কাজগুলো বিশ্বস্তভাবে এবং নীরবে করলে ক্ষুদ্র কাজও মহৎরূপে মানুষের চোখে ধরা দেয়। অর্থাৎ, আমার/আপনার কর্মই আমাদের জীবন সাক্ষ্য বহন করবে। পৃথিবীতে অনেকেই সাধু যোসেফের মতো নীরবে-নিভৃতে কল্যাণকর কাজ করে চলেছেন, যারা মানুষের দৃষ্টির অগোচরে রয়ে গেছেন। কিন্তু মহৎ কাজ কখনো চাপা থাকে না। একদিন না একদিন তা প্রকাশ পাবেই। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় মনে হয় যে, দেখানোর প্রবণতা সর্বত্রই লক্ষণীয়। এখন সবাই দু-একটি কাজ করে মানুষের প্রশংসা কুড়োতে বেশি ভালোবাসেন। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধর জন্য দু-এক পয়সা খরচ করে মানুষের চোখের নজরে আসার জন্য বা মানুষের বাহবা পাওয়ার জন্য মিডিয়া থেকে শুরু করে বর্তমান নগর জীবনের মানুষ কতো কিছুই না প্রচার-প্রচারণা করে থাকে । নিজ দায়িত্ববোধ থেকে কোনো কাজে হাত বাড়িয়ে দেওয়ার মানুষ বর্তমান বাস্তবতায় খুব অল্প সংখ্যকই দেখা যায়।

আমরা সবাই কোনো না কোনোভাবে একজন শ্রমিক। শ্রমিক দিবসে সকল শ্রমিকদেরকে শুভেচ্ছা জানাই। সেই সাথে সকল শ্রমজীবি ভাই-বোনদের জন্য, সর্বোপরি সবাইকে আহ্বান করি, আসুন আমরা বিনাশর্তে ও সর্বদা ঈশ্বরের ইচ্ছাকে গ্রহণ করে, নিজেদের দায়িত্ববোধ থেকে নীরবে এবং বিশ্বস্থভাবে সাধু যোসেফের আদর্শে আমাদের করণীয় কাজগুলো করতে চেষ্ট করি॥

সহায়ক গ্রন্থ:

১. পবিত্র মঙ্গলবার্তা
২. দ্বিমাসিক মঙ্গলবার্তা-১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ

শ্রেষ্ঠ পিতা ও বিশুদ্ধ স্বামী সাধু যোসেফ

সিস্টার মেরী অরিলিয়া এস এম আর এ

মানবেশ্বর খ্রিস্ট স্বয়ং যাকে দেখালেন পিতৃকল্প সম্মান, খ্রিস্ট জননী নারীকূল কান্তি বিশ্বমাতা মারীয়া যাকে দিলেন পত্নী প্রেমের নির্মল হৃদয়ের ভক্তি-শ্রদ্ধা, স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা যাকে দিলেন পরিবারের

সর্বময় কর্তা হওয়ার ও আর্দশ পরিবারের যোগ্যতা । তিনি হলেন শ্রেষ্ঠ পিতা ও বিশুদ্ধ স্বামী সাধু যোসেফ। সত্যিই সাধু যোসেফের সম্মান ও গৌরব বিপুল এবং তা চিরন্তন বটে। তিনি ঈশ্বরের মনোনীত ভক্ত, ধন্যা কুমারী মারীয়ার বিশুদ্ধ স্বামী, খ্রিস্টের পালক পিতা, এবং খ্রিস্ট মণ্ডলীর ও সন্ন্যাসী কুমারীদের রক্ষক। সাধু যোসেফের শ্রেষ্ঠত্ব তার চরিত্রের বহুমুখী পুণ্যগুন রাশির দীপ্তি বিকাশেরই প্রতিফলন। ব্যক্তিগত দিক দিয়ে তিনি যিশুর পিতা না হলেও খ্রিস্ট জননীর আর্দশ স্বামী হিসেবে তাদের পালনকারী রক্ষাকারী। তাই তো তিনি ত্যাগময় একটি আদর্শ পরিবার গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। সাধু যোসেফের মহান যে চরিত্র গুণালংকারে বিভূষিত ছিল, তন্নধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য তাঁর ঐশ্বেচ্ছাধীনতা, কৌমার্যদীপ্ত, অনাবিল বিশুদ্ধতা, বিশ্বস্ততা, সাহসীকতা, ধৈর্য্যশীলতা ও কতর্ব্য নিষ্ঠতা। তিনি শিশু যিশুকে ও মা মারিয়াকে সমস্ত বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করেছেন। বিশেষভাবে শিশু যিশুকে হেরোদের রোষানলের মুখ থেকে রক্ষা করতে মিশরে পালিয়ে গিয়েছেন, পথিমধ্যে সমস্ত বাধা-বিঘ্ন, বিপদ, সংকট উপেক্ষা ও অগ্রাহ্য করে। মারিয়ার সুনাম ও শুচিতা রক্ষায় তিনি ছিলেন অনন্য। খ্রিস্টের ও মারীয়ার ভরণ-পোষণ, অভাব অনটন পূরণ করতে তিনি ছুঁতোর কাজ করেছেন। এ কারণে ঐশ পিতা তাকে বিশ্বস্ততার প্রতিদান স্বরূপ দিয়েছেন মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্তে মাতা ও পুত্রের আবেগময় আলিঙ্গন ও তৃপ্তির অশেষ আনন্দ। তাই তো আমরা ভলো মৃত্যুর জন্য সাধু যোসেফের কাছে প্রার্থনা করি। সাধু যোসেফ হলেন আদর্শ বীর, তিনি মা মারিয়া ও পুত্রকে নিয়ে মন্দিরে যান কিন্তু সেখানে পুত্র যিশুকে হারিয়ে ফেলেন। তিন দিন পর তাকে ফিরে পান। কিন্তু তাতেও তার মুখমন্ডলে ভেসে উঠেনি কোন কুটুক্তির ছাপ। মহা মন্দিরে সিমিয়োনের ভবিষ্যৎবাণী শুনেও তা অন্তরে পোষণ করেছেন। কিন্তু খ্রিস্টের মহিমা প্রকাশের সময় তিনি আর বেঁচে রইলেন না, আশ্চর্য কাজ সম্পাদনের পূর্বেই তিনি চোখ বুঝলেন। অর্থাৎ জীবনের সমাপ্তি লগ্নে মৃত্যুকে বরণ করে নিলেন।

বিপর্যয়ের নগর দোলায় কেটেছে সাধু যোসেফের জীবন। বিভিন্ন ভয়, দুশ্চিন্তা, হতাশা-নিরাশা থাকলে ও তাঁর অন্তরে ছিল অক্ষয় আনন্দ। কারণ জীবনের প্রতিক্ষণেই তিনি পেয়েছেন ঈশ্বরের বিশেষ কৃপা ও আশীর্বাদ। সর্বদা ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে মেনে চলাই ছিল তাঁর পরমানন্দ। তাই তো তিনি স্বপ্নাদর্শন করে তা মেনে নিয়ে সেভাবেই জীবন-যাপনে অগ্রসর হয়েছেন। সমগ্র মানবের প্রতি দেখিয়েছেন সার্বজনীন, সাবলীল ও সংহত ভক্তি-ভালবাসা। সাধু যোসেফ আজো বিশ্বমন্ডলীর সার্বজনীন রক্ষক, মণ্ডলীর আচার্যগণের গুরু, শ্রমজীবিগণের নেতা, আদর্শ পবিত্র পরিবারের চালক, সকল কুমারী সন্ন্যাসীগণের প্রতিপালক । তাই আজ সমগ্র বিশ্ব মণ্ডলী সাধু যোসেফকে শ্রদ্ধা ভরে স্মরণ করছে, এবং জীবনাদর্শ হিসেবে বেছে নিচ্ছে তাঁর মহান ব্যক্তিত্বের আদর্শ। কারণ তিনি হচ্ছেন মানব জগতের উজ্জ্বল ধ্রুবতারা। তাই সাধু যোসেফের এই পর্বদিনে সাধু যোসেফ যাদের প্রতিপালক তাদের সকলকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন॥

৩৪তম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত পল পালমা

জন্ম : ০২-১২-১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ

মৃত্যু : ০৩-০৫-১৯৮৭ খ্রিস্টাব্দ

দক্ষিণ ভাদার্তী, তুমিলিয়া মিশন

দেখতে দেখতে ৩৪টি বছর পার হয়ে গেল। যদিও আজ তুমি নেই তবু আমাদের জীবনে তোমার অভাব এখনও প্রকট। প্রার্থনা করি পরম পিতার কাছে তুমি শান্তিতে থেকে আমাদেরকে আশীর্বাদ করবে যেন, তোমার আদর্শ থেকে বিচ্যুত না হই। ঈশ্বর তোমার আত্মাকে অনন্তধামে চিরশান্তি প্রদান করুন।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে

স্ত্রী : ডরথী আর. পালমা

ছেলে-ছেলে বৌ : সুজিত-রত্না, সুধীর-ওয়েস্তি

মেয়ে-মেয়ে জামাই : পাস্কা-মৃত জেম্‌স অরুণ, মালতী-জন, রীনা-পরিমল, রীটা-মাইকেল

নাতি-নাতনী : রনা, অংকন, অর্পণ, শাওন, তূরী, বেনডেন, ইলেন, স্তুতি, আর্চি ও এমিলিন পালমা।

বিজ্ঞ/১২৪/২১

পোপ ফ্রান্সিসের প্রৈরিতিক পত্র: ‘এক পিতার হৃদয় দিয়ে’ এর আলোকে ধারণাপত্র ও অনুধ্যান

সংকলনে : মানিক উইলভার ডি’কস্তা

(পূর্ব প্রকাশের পর)

৫) এক অভিনব সাহসী পিতা

প্রকৃত পুনর্মিলনের জন্য যেমন প্রাথমিকভাবে আমাদের ব্যক্তিগত জীবন ইতিহাসকে গ্রহণ করা প্রয়োজন, প্রয়োজন জীবনের অনাকাঙ্খিত অবস্থা ও সময়কে আলিঙ্গন করা, তেমনি প্রয়োজন অভিনব সাহস। জীবনের জটিলতাগুলো আমরা কিভাবে মোকাবিলা করছি, তা থেকেই প্রকাশিত হয় আমাদের অভিনব সাহসী মনোভাব। জটিলতায় আমরা হাল ছেড়ে দিতে পারি, এড়িয়ে যেতে পারি; আবার জটিলতাগুলো সাহসের সাথে মোকাবেলাও করতে পারি। জীবনের কঠিন ও জটিল অবস্থা আমাদের অমিত সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিতে পারে, যা আমরা কখনো হয়তো কল্পনাই করিনি।

যিশুর জন্মকাহিনী যখন আমরা পড়ি, মাঝে-মাঝে হয়তো ভাবি, কেন ঈশ্বর সরাসরি কাজ করেন না। তথাপি ঈশ্বর কিন্তু ঘটনা এবং মানুষের মধ্যদিয়েই কাজ করেছেন। যোসেফ হচ্ছে প্রকৃত ‘‘আশ্চর্য কাজ”, যাকে পরমেশ্বর শিশু যিশু ও মারিয়াকে রক্ষা করার জন্য মনোনীত করেছেন, ঈশ্বর সরাসরি যিশু ও মারিয়াকে রক্ষা করেননি। যোসেফের অভিনব সাহসে ঈশ্বর আস্থা রেখেছেন। বেথলেহেমে পৌঁছে কোন সরাইখানায় জায়গা না পেয়ে যোসেফ নিজের বিবেচনা ও সাহসেই একটি আস্থাবল বেছে নিলেন, এবং একেই ঈশ্বর পুত্রকে জগতে স্বাগত জানানোর গৃহে রূপান্তরিত করেন *(দ্র: লুক ২: ৬-৭)*। হেরোদের মাধ্যমে যিশুর মৃত্যুভয় ছিল, কিন্তু যোসেফের মাধ্যমে ঈশ্বর তাকে আবার রক্ষা করেন *(দ্র: মথি ২: ১৩-১৪)*।

জাগতিক ক্ষমতার অহংকার ও সহিংসতার মধ্যেও ঈশ্বর পরিত্রাণ কাজ চলমান রাখার পথ ঠিকই খুঁজে নেন। মাঝে-মাঝে মনে হতে পারে, আমাদের জীবন হয়তো ক্ষমতাবানদের দয়ার হাতেই পড়ে আছে; কিন্তু মঙ্গলসমাচার আমাদের উপলব্ধি করায়, প্রকৃতপক্ষে কে আমাদের রক্ষা করতে পারেন। ঈশ্বর সবসময়ই আমাদের রক্ষা করার পথ বের করেন, যদি আমরা নাজারেথের কাঠমিস্ত্রির মত অভিনব সাহস দেখাতে সক্ষম হই, যিনি পরমেশ্বরের অনুগ্রহে বিশ্বাস করে একটি সমস্যাকে সম্ভাবনায় রূপান্তর করতে জানতেন।

মাঝে-মাঝে এমন মনে হয় যেন ঈশ্বর আমাদের সাহায্য করছেন না, এর মানে এই নয় যে ঈশ্বর আমাদের ভুলে গিয়েছেন; কিন্তু তিনি চান আমরা যেন পরিত্রাণ পরিকল্পনায় বিশ্বাস রাখি, সৃষ্টিশীল হই, এবং সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার পথ নিজেরা খোঁজার চেষ্টা করি। এমন সৃষ্টিশীলতার উদাহরণ আমরা দেখি বাইবেলের সেই একদল লোকের মধ্যে, যারা তাদের পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগীকে ভিড়ের জন্য যিশুর কাছে নিতে পারছিলেন না। শেষে তারা যিশু যে ঘরে আছেন সেই ঘরের ছাদের টালি সরিয়ে খাটিয়া সহ তাকে যিশুর সামনে নামিয়ে দিলেন। *(দ্র: লুক ৫: ১৭-২০)*। আর পক্ষাঘাতগ্রস্ত লোককে যারা এনেছেন, “তাঁর প্রতি তাদের এমন বিশ্বাস দেখে” *(দ্র: ৫:২০)* যিশু লোকটির পাপ ক্ষমা করেন।

মিশরে কত সময় মারিয়া, যোসেফ ও যিশুর থাকতে হয়েছে, মঙ্গলসমাচারে তা লেখা নেই। কিন্তু অবশ্যই সেখানে তাদের খেতে হয়েছে, একটি ঘরের ব্যবস্থা করতে হয়েছে, সংসার চালাতে কাজ করতে হয়েছে। পুণ্য পরিবারকে আমাদের পরিবারের মতই জাগতিক অবস্থা ও চ্যালেঞ্জকে মোকাবিলা করতে হয়েছে। দূর্ভাগ্য ও ক্ষুধার হাত থেকে বাঁচতে আজ যারা বিভিন্ন দেশে ঝুঁকি নিয়ে শরনার্থী হয়েছে, বিশেষভাবে তাদের মত পুণ্য পরিবারকেও একই ভাগ্য বরণ করতে হয়েছে। যুদ্ধ, ঘৃণা, নির্যাতন ও দারিদ্রের কারণে জন্মভূমি ছেড়ে অন্য দেশে শরনার্থী হওয়া মানুষের জন্য সাধু যোসেফকে পোপ ফ্রান্সিস বিশেষ প্রতিপালক বলে বিবেচনা করেন।

আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা হওয়া উচিত– আমরা নিজেরা কি যিশু ও মারিয়াকে রক্ষা করছি, খ্রিস্টিয় রহস্যে যিশু ও মারিয়াকে তো আমাদের দায়িত্বেই দেয়া হয়েছে। চরম অসহায় অবস্থায় ঈশ্বর পুত্র আমাদের জগতে এসেছেন। যোসেফের মাধ্যমে তাকে সুরক্ষা ও যত্ন পেতে এবং বেড়ে উঠতে হয়েছিল। মারিয়া যেখানে মণ্ডলীর মাতা হিসেবে মণ্ডলীর সুরক্ষা নিশ্চিত করছেন, যোসেফ সেখানে প্রতিনিয়ত শিশু যিশু ও মারিয়াকে সুরক্ষা দিয়েছেন, এবং আমরাও মণ্ডলীর প্রতি ভালবাসায় প্রতিনিয়ত শিশু যিশু ও মা-মারিয়াকে ভালবেসে চলেছি। সেই শিশুই একদিন বলবে, “আমি তোমাদের সত্যিই বলছি, আমার এই তুচ্ছতম ভাইদের একজনেরও জন্যে তোমরা যা-কিছু করেছো, তা আমারই জন্যে করেছো” *(মথি ২৫: ৪০)*। প্রকৃত অর্থে, প্রত্যেক দরিদ্র, অভাবী, কষ্টভোগী ও মৃত্যুপথ যাত্রী, প্রত্যেক শরনার্থী, প্রত্যেক বন্দী, প্রত্যেক অসুস্থ ব্যক্তি হচ্ছেন “শিশু যিশু” যাকে যোসেফ প্রতিনিয়ত রক্ষা করেন। যোসেফের কাছ থেকে একই যত্ন ও দায়িত্ব নেয়ার শিক্ষা আমরা পাই। আমাদের উচিত এইসব মানুষকে ভালবাসার মাধ্যমে শিশু যিশু ও মা-মারিয়াকে ভালবাসা, পুণ্য সংস্কার ও দয়ার কাজকে ভালবাসা, মণ্ডলী ও দরিদ্রদের ভালবাসা। এই সব মানুষ ও জীবন অবস্থাই-তো শিশু যিশু ও তার মা মারিয়া।

৬) এক শ্রমিক পিতা

সাধু যোসেফ একজন কাঠমিস্ত্রি ছিলেন, সৎ পথেই তার পরিবারের জন্য উপার্জন করেছেন। তার কাছ থেকে যিশু কর্মের মহত্ত্ব ও মর্যাদা শিখেছেন, সৎভাবে রুটি ও রুজি যোগাড় করার আনন্দ কি তা উপলব্ধি করেছেন।

বর্তমান সময়ে ‘বেকারত্ব’ একটি সামাজিক ব্যাধি। যদিও শত-শত বছর ধরে বিভিন্ন দেশ ও জাতি উন্নতির পথে হাঁছে, তথাপি বর্তমানে বেকারত্ব চরম আকার ধারণ করেছে। মর্যাদাপূর্ণ কাজ বা পেশার নিশ্চয়তা বিধান করার উদ্দেশ্যে অনেক উদ্যোগ নেয়ার এখনো প্রচুর অবকাশ আছে।

কর্মের মাধ্যমে মানুষ পরিত্রাণ কাজে অংশগ্রহণ করে। যে পরিবারে কারো কাজ নেই, সে

পরিবার জটিলতা, দুশ্চিন্তা এবং পরিবার ভাঙ্গনের হাতে নিতান্ত অসহায়। প্রত্যেকে যেন বেঁচে থাকার মত উপার্জন করতে পারে তা নিশ্চিত না করে কিভাবেই বা আমরা মানব মর্যাদার কথা বলতে পারি?

কর্মজীবি মানুষ, তা তার পেশা যা-ই হোক না কেন, স্বয়ং ঈশ্বরের সহকর্মী এবং কোন না কোনভাবে আমাদের চারপাশের জগতে বহু কিছুর সৃষ্টিকর্তা। বর্তমান সংকট যা আমাদের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক জীবনকে প্রভাবিত করছে, তা পুনরায় আমাদের কর্মের মর্যাদা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আবিষ্কার করার আহ্বান জানায়, যাতে নিশ্চিত হয় এক 'নব্য স্বাভাবিক' অবস্থা (New Normal), কেউই যে অবস্থার বাইরে নয়। কোভিড-১৯ মহামারীজনিত কারণে বিশ্বব্যাপী অনেক ভাই ও বোনের কর্মহীনতা আমাদের সামগ্রিক অগ্রাধিকার ও মনযোগ পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানাচ্ছে। সাধু যোসেফকে মিনতি জানাই, আমাদের দৃঢ় প্রত্যয় দান করো, যেন কোন যুব, কোন ব্যক্তি, কোন পরিবার কর্মহীন না থাকে, সেই উদ্দেশ্য যথ াসাধ্য চেষ্টা করে যেতে পারি।

৭) ছায়ার মত এক পিতা

যিশুর সাথে যোসেফের পারিবারিক সম্পর্কে তিনি ছিলেন স্বর্গীয় পিতার পার্থিব ছায়ার মত। তিনি তাকে চোখে চোখে রেখেছেন, তাকে রক্ষা করেছেন এবং নিজের খেয়াল খুশী মত না চলতে পরিচালনা দান করেছেন। মরুপ্রান্তরে ইস্রায়েলের প্রতি মোশীর উক্তি আমরা স্মরণ করতে পারি, "মরু এলাকায়... তোমরা তো দেখেছ, বাবা যেমন ছেলেকে কোলে করে নিয়ে যান তেমনি করে এই জায়গায় না পৌঁছানো পর্যন্ত তোমাদের ঈশ্বর সদাপ্রভুও সারাটা পথ তোমাদের বয়ে নিয়ে এসেছেন" *(দ্বিতীয় বিবরণ ১: ৩১)*। একইভাবে, যোসেফ জীবনব্যাপী যিশুর পিতা হয়েই ছিলেন।

পিতার জন্ম হয় না, পিতা গড়ে ওঠে। জগতে এক মানব শিশুর জন্ম দিয়েই পুরুষ বাবা হয়ে যায়না। কিন্তু সন্তানের প্রতি যত্ন ও দায়িত্ব পালনেই পুরুষ পিতায় রূপান্তরিত হয়। যখনই কোন মানুষ অন্য কারো জীবনের জন্য দায়িত্ব গ্রহণ করে, কোন না কোনভাবে সে ঐ ব্যক্তির পিতায় রূপান্তরিত হয়।

আজ অনেক শিশু আছে যারা পিতৃহীন। মণ্ডলীতে অনেক পিতা প্রয়োজন। "খ্রিস্টিয় জীবনে তোমাদের পথ দেখাবার মতো হাজার হাজার লোক থাকতে পরে, কিন্তু তোমাদের পিতা এই একজন।" *(১ করি ৪: ১৫)* সাধু পলের এই উক্তির সাথে প্রত্যেক বিশপ ও যাজকের এই কথা যোগ করার সক্ষমতা থাকা প্রয়োজন, "মঙ্গলসমাচারের মাধ্যমে খ্রিস্ট যিশুতে আমি তোমাদের পিতা হয়েছি"। যেভাবে সাধু পল গালাতীয়দের সন্তান ডেকেছেন "আমার স্নেহের সন্তানেরা, তোমাদের কথা ভেবে আমি যেন আবার প্রসব-বেদনায় কাতর; যতদিন না তোমাদের অন্তরে স্বয়ং খ্রিস্ট মূর্ত হয়ে ওঠেন, ততদিনই কাতর থাকব আমি!" *(৪: ১৯)*।

জীবন ও বাস্তবতার সাথে সন্তানকে পরিচয় করানোই পিতৃত্বের প্রকৃত উদ্দেশ্য। তাদেরকে পিছু টানা নয়, অতিরিক্ত অধিকারে তাদের নিয়ন্ত্রণ করা নয়। কিন্তু সন্তান যেন নিজেদের জন্য সিদ্ধান্ত নিতে, স্বাধীনতা উপভোগ করতে এবং নতুন সম্ভাবনা আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়, সেইমত সন্তানকে গড়ে তোলাই প্রকৃত পিতার কাজ। যোসেফকে সবচাইতে পুণ্য পিতা বলা হয়। পুণ্য পিতার প্রকাশ শুধু মমতায় নয়, কিন্তু প্রকাশিত হয় সন্তানকে অধিকার করে রাখার মানসিকতা হতে মুক্তিতেই। পুণ্য ভালবাসা অধিকার ত্যাগ করে। পুণ্য ভালবাসাই প্রকৃত ভালবাসা। ভালবাসায় যখন অতিরিক্ত অধিকারবোধ কাজ করে, তখন তা প্রিয়জনকে বন্দী করে, সীমাবদ্ধ করে এবং জন্ম দেয় সীমাহীন যাতনার। ঈশ্বর আমাদের পবিত্র ভালবাসায় আলিঙ্গন করেছেন; তিনি এমনকি আমাদের বিপথে যাওয়ার স্বাধীনতা দিয়েছেন, তার বিরুদ্ধাচারণ করার স্বাধীনতাও দিয়েছেন। ভালবাসার যুক্তি হলো স্বাধীনতায়, আর যোসেফ জানতো কিভাবে অনন্য স্বাধীনতা দিয়ে ভালবাসতে হয়।

যোসেফ শুধু আত্মত্যাগেই জীবনের সুখ উপলব্ধি করেননি, তিনি আত্মঅনুগ্রহেই সুখ খুঁজে পেয়েছিলেন। তার জীবনে আমরা কখনো হতাশা দেখি না, দেখি শুধু অগাধ বিশ্বাস। আমাদের পৃথিবীতে পিতার মত মানুষ দরকার। নিজের প্রয়োজনে কারো জন্য কিছু করার মানসিকতাপূর্ণ ধূর্ত মানুষ মানবতার কাজে আসে না। যারা কর্তৃত্বকে কর্তৃত্বপরায়নতা, সেবাকে দাসত্ব, আলোচনাকে বিরোধ, দয়াকে উন্নয়ন মনোভাব, ক্ষমতাকে ধ্বংসের পথ বলে ভুল করে, পৃথিবী তাদের আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে। আত্মঅনুগ্রহেই প্রকৃত আহ্বান উন্মোচিত হয়, যা হলো পরিণত আত্মত্যাগেরই ফল। আমাদের আহ্বান পরিবার, যাজকত্ব বা উৎসর্গীকৃত জীবন যা-ই হোক না কোন, আমাদের আত্ম অনুগ্রহ কখনোই পূর্ণতা পাবে না যদি তা শুধু আত্মত্যাগেই যথেষ্ট হয়েছে বলে থেমে যায়। সেক্ষেত্রে আমাদের জীবন সৌন্দর্য এবং ভালবাসাময় আনন্দের প্রকাশ না হয়ে অসুখী, ব্যথিত এবং হতাশাপূর্ণ জীবনবোধ তৈরীর ঝুঁকিতে পড়ে যাবে।

আমরা সবাই যোসেফের মতই আমাদের স্বর্গীয় পিতার ছায়া, যিনি সৎ-অসৎ সকলেরই জন্যে ফুটিয়ে তোলেন তাঁর সূর্যের আলো, আর ধার্মিক অধার্মিক সকলেরই ওপর তিনি নামিয়ে আনেন তাঁর বৃষ্টিধারা *(দ্রঃ মথি ৫: ৪৫)*।

পালকীয় পত্রের শেষাংশে পুণ্য পিতা লিখেছেন, তার পালকীয় পত্রটির উদ্দেশ্য হলো মহান সাধু যোসেফের প্রতি আমাদের ভালবাসা বৃদ্ধি করা, তাঁর মধ্যস্থতায় অনুনয় প্রার্থনা করা এবং পুণ্য ও সদ্গুণাবলী এবং উৎসাহী মনোভাবকে অনুসরণ করা। সাধু সাধ্বীগণের মূল প্রেরণকাজ শুধু আমাদের জন্য আশ্চর্য কাজ ও অনুগ্রহ দান করা নয়, বরং ঈশ্বরের কাছে আমাদের জন্য অনুনয় প্রার্থনা করা।

পবিত্র ও পরিপূর্ণ জীবন অর্জনে সাধনা করতে সাধু সাধ্বীগণ আমাদের সাহায্য করেন। নৈমিত্তিক জীবন-যাপনকে যে মঙ্গলসমাচারীয় করে তোলা সম্ভব, সাধু-সাধ্বীগণের জীবনি আমাদের সামনে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

যিশু বলেন, "তোমরা কাঁধে তুলে নাও আমারই জোয়াল, আমারই শিষ্য হও তোমরা; কারণ আমি যে কোমল, বিনম্র হৃদয় আমি" *(মথি ১১: ২৯)*। সাধু-সাধ্বীগণের জীবনও অনুসরণযোগ্য। সাধু পল তো বলেছেনই, "আমি যেভাবে চলি, তোমরাও সেইভাবেই চল" *(১ করি ৪: ১৬)*। সরব নীরবতায় সাধু যোসেফও আমাদের একই কথা বলছেন।

সাধু যোসেফের কাছে আমরা সর্বোত্তম অনুগ্রহের জন্য অনুনয় করি: সাধু যোসেফ-আমাদের রূপান্তর করো।

পরিশেষে সাধু যোসেফ-এর বর্ষ উপলক্ষে তার মধ্যস্থতায় একটি বিশেষ প্রার্থনা রচনা করেছেন পোপ ফ্রান্সিস, যার মাধ্যমেই শেষ হয়েছে পালকীয় পত্রটি।

৮ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে কুমারী মারিয়ার অমলোদ্ভব মহাপর্ব দিনে সাধু যোহনের মন্দির হতে পোপ ফ্রান্সিস কর্তৃক পালকীয় পত্রটি প্রকাশিত হয়॥ (চলবে)

উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এবং রূপকল্প ২০৪১

প্রভাষক উত্তম দাস

রূপকল্প (VISION) স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া যায় যে একটি পরিকল্পনা, একটি ছবি, একটি নিদর্শনা, একটি কল্পনাপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি, একটি দূরদর্শিতা, একটি ছায়ামূর্তি বা একটি মনের মধ্যে অঙ্কিত বাসনা। মানুষ তার স্বপ্নের মাঝে যেমন নিজেকে খুঁজে পেতে চায় ঠিক তেমনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জন নেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে কোথায় দেখতে চেয়েছেন তারই সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনার আর এক নাম রূপকল্প ২০৪১। অন্যকথায় বলা যায়, জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল কর্তৃক প্রণীত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থানকে আরও দৃঢ় করে গড়ে তোলার জাতীয় কৌশলগত পরিকল্পনাই হলো রূপকল্প ২০৪১।

উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বলতে সেই বাংলাদেশকে ধারণায় চিত্রায়িত হয়েছে যেখানে বাংলাদেশ হবে উন্নয়নের রোল মডেল, স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের উত্তরণ যে বাংলাদেশে থাকবে না কোন বৈষম্য, কোন ক্ষুদা বা দারিদ্রতা । এক কথায় বাংলাদেশ হবে হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালী, জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের লালিত সেই সোনার বাংলা।

বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন দর্শন থেকে আমরা তার রাজনৈতিক দূরদর্শিতার মাধ্যমে বাংলাদেশের উন্নয়নের দর্শন খুঁজে পাই। ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের ১০ জানুয়ারি তার স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ভাষণে আমরা দেখি তিনি স্বাধীন বাংলাদেশ নির্মানে কি চমৎকার ভাবে ১৫টি দিক নির্দেশনা দিয়েছিলেন। তিনি স্বাধীন বাংলাদেশের আর্থসামাজিক রূপরেখা সম্পর্কে বলেন, 'বাংলাদেশ একটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে। আর তার ভিত্তি কোনো ধর্মীয়ভিত্তিক হবে না। রাষ্ট্রের ভিত্তি হবে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা (পরবর্তীতে সংযোজিত হয়েছিল জাতীয়তাবাদ)' । আবার ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মার্চের ভাষণে তিনি রাষ্ট্র কাঠামোর চরিত্রের রূপরেখা উপস্থাপন করেছিলেন। বঙ্গবন্ধু তার ভাষণে বলেছিলেন, 'এই বাংলায় হিন্দু-মুসলমান, বাঙালী, অবাঙালী যারা আছে তারা আমাদের ভাই। তাদের রক্ষর দায়িত্ব আপনাদের ওপর'- অর্থাৎ অসাম্প্রদায়িক এক বাংলাদেশের চিত্র এঁকেছিলেন তিনি। বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতেও আমরা দেখতে পাই- জনগণের উপর তার আস্থা ও ভালবাসার কথা। বঙ্গবন্ধুর উন্নয়ন-দর্শনের সারকথা ছিল সাধারণ মানুষের উন্নয়ন, কোনো গোষ্ঠী বিশেষের উন্নয়ন নয়। তাঁর দর্শনে গণমানুষের মুক্তির কথাই ছিল বারবার। সেজন্য শেষ পর্যন্ত তার হাত ধরেই জন্ম হলো গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ, যেখানে সাংবিধানিকভাবেই 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক হলো জনগন'। এ দর্শনে স্পষ্ট প্রতিফলন তার সোনার বাংলার স্বপ্ন, দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর স্বপ্ন, শোষণ বঞ্চনা-দুর্দশামুক্ত বাংলাদেশের স্বপ্ন।

আজ ২০২১ খ্রিস্টাব্দের দাঁড়িয়ে তাঁরই সুযোগ্য কন্যা জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কর্মকৌশল আমাদেরকে জানান দিচ্ছে বাংলাদেশের রূপকল্প ২০৪১। তারই গতিশীল ও দুরদর্শী নেতৃত্বে স্বল্পন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দের প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি (সিডিপি)-এর তিন সূচক- মাথাপিছু আয়, মানবসম্পদ, জলবায়ু ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার পূরণ করে। ফলে এ বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারি সিডিপি বাংলাদেশকে ২০২৬ খ্রিস্টাব্দের স্বল্পোন্নত দেশের (এলডিসি) তালিকা থেকে বের হেওয় যাওয়ার সুপারিশ করেছে। সমগ্র জাতির জন্য এটা যেমন গর্বের তেমনি অহংকারের ও বটে। সেজন্য বলা যায় আজকের বাংলাদেশ বদলে যাওয়ার বাংলাদেশ। বিগত ১২ বছরের নিরলস পরিকল্পনা, পরিশ্রম ও প্রচেষ্টার ফসল এই বদলে যাওয়া বাংলাদেশের। বর্তমান সরকার তার গৃহীত ভিশন-২০২১ থেকে শুরু করে ভিশন ২০৪১ এর মূল অনুষঙ্গ যা গত দশকের প্রশংসনীয় অগ্রগতিতে অবদান রেখেছে। যার কারণেই বলা যেতে পারে প্রথম দেশ হিসেবে বাংলাদেশই এলডিসি থেকে উত্তরণ মানদণ্ডের তিনটি সুচক একবারেই অর্জন করেছে। অবশ্য এ আর্ন্তজাতিক স্বীকৃতি আমাদের দেশের জন্য নুতন সুযোগ সৃষ্টি করবে।

দেশে চলমান মেগা প্রকল্পগুলি আমাদের জানান দেয় বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল কি না? **ক)** পদ্মা সেতু প্রকল্প, **খ)** রুপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র **গ)** কর্ণফুলি ট্যানেল ঘ) পায়রা বন্দর **ঙ)** বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্পনগরী **চ)** হযরত শাহজালাল আর্ন্তজাতিক বিমান বন্দরের টার্মিনাল -৩, **ছ)** মেট্রেরেল প্রকল্প ইত্যাদি। এই প্রকল্পগুলিই জানান দেয় বাংলাদেশ এ উত্তরণের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় কতটা সক্ষম।

টেকসই উত্তরণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় (8FYP) বাংলাদশে যেসব কৌশল অর্ন্তভুক্ত করেছে তা হলো- **ক)** অর্থনীতির বিকাশ ত্বরানিবত করা, **খ)** মানসম্পন্ন চাকুরী সৃষ্টি করা **গ)** দ্রুত দারিদ্র হ্রাস করা **ঘ)** সামাজিক সুরক্ষার সঙ্গে অন্তভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়া **ঙ)** জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত উন্নয়ন কৌশল, **চ)** এসডিজির লক্ষ্য অর্জন **ছ)** এলডিসি উত্তরনের প্রভাবগুলো মোকাবেলা ইত্যাদি। এ পরিকল্পনার মূল কাজ হচ্ছে এমনভাবে ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়ন করা যাতে বাংলাদেশ উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদা লাভ, এসডিজির বড় লক্ষ্যগুলো অর্জন এবং ২০৩০-৩১ অর্থবছরের মধ্যে চরম দারিদ্র দূর করতে পারে।

যেখানে ১৬ কোটি মানুষের প্রাণের দেশ বাংলাদেশ সেখানে সকলেই মিলে সোনার বাংলা বিনির্মানে একত্রিত হয়ে ৩২ কোটি হাতের স্পর্শে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। যে বাংলাদেশ হবে বদলে যাওয়ার বাংলাদেশ, যে বাংলাদেশ হবে সোনার বাংলাদেশ॥

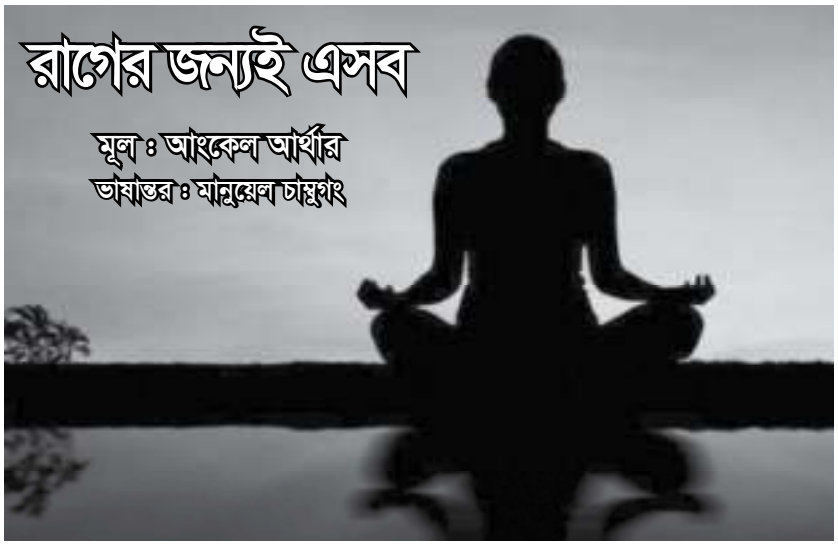

রাগের জন্যই এসব

মূল ঃ আংকেল আর্থার
ভাষান্তর ঃ মানুয়েল চাম্বুগং

খেলতে-খেলতে একসময় ট্রেভর ও জেসনের মধ্যে তুমুল ঝগড়া বাদে। শরীরিরের সর্বোচ্ছ শক্তি দিয়ে তারা একে অপরকে কিল ঘুষি মারে। তাদের ঝগড়া দেখে দূর দেখে এক বৃদ্ধ দৌড়ে এসে ধমকের সুরে বলল, "বন্ধ কর তোমাদের ঝগড়া, আর কখনও এভাবে ঝগড়া করবে না।" ট্রেভর ও জেসন ঝগড়া থামিয়ে বৃদ্ধ বার্ণির দিকে তাকায়। বন্ধুর মতো দুইজনকে দুইবাহুতে আঁকড়ে ধরে তাদের দিকে সে মাথা নিচু করে দেখে। এতে ট্রেভর ও জেসন আর ঝগড়া করতে পারে না। পকেটে হাত ঢুকিয়ে পরস্পরের দিকে চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে থাকে। বৃদ্ধ বার্ণি বললো, "চলো আমরা নৌকায় কিছুক্ষণ বসি; আমি তোমাদের জন্য একটি গল্প বলবো।" ট্রেভর ও জেসন বিনয়ের সহিত বৃদ্ধ বার্ণির দুইপাশে হাটে। কিছু দূর হেঁটে তিনজনেই একটি নৌকার উল্টোপিটে বসলো।

বৃদ্ধ বার্ণি গল্প বলা আরম্ভ করলো, "তোমাদের মতো ছোট থাকতে বড় ভাই ও আমি প্রায়ই চাকা-গাড়ি খেলতাম। জেসন জিজ্ঞেস করলো, " চাকা-গাড়িটা কি জিনিস?" বৃদ্ধ বার্ণি বলল, "এটি সাধারণত লোহা টুকরোর ১.৩ মিটার দিয়ে গোলাকারভাবে বানানো হয়। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভাঙ্গা চালুনির গোলাকার অংশটি বা কাঠ দিয়ে গোলাকার করে বানিয়ে চাকা-গাড়ি হিসেবে খেলে থাকে। আর বড় ছেলেরা লোহার বানানো চাকা-গাড়ি বেশি খেলা করে। ছোট একটি শিক বা লোহা বেকিয়ে ব্রেক বানিয়ে তারা এই ধরণের গাড়ি চালায়।"

একদিন বড় ভাই ও আমি চাকা-গাড়ি খেলছিলাম। বাঁশ দিয়ে তৈরি গাড়িটা আমি খেলছিলাম। বড় ভাই খেলছিলেন লোহার গাড়িটা। তার গাড়িটা চালিয়ে দেখার জন্য আমি চাইলাম। কিন্তু সে আমাকে চালাতে দিলো না তো দিলোই না বরং বলল, "আমি নিজেই ভাল মতো চালাতে পারছি না আর তুমি তো ছোট মানুষ আরো চালাতে পারবে না।" "চালাতে পারবো দাদা, একবার শুধু আমাকে সুযোগ দাও। আমি তোমাকে দেখাবোনে কিভাবে চালাতে হয়।" "না, আমি কোনো মতেই তোমাকে দিতে পারবো না।" রাগ করে আমি বড় ভাই এর বুকে একটা ঘুষি মারি। সেও আমার মাথায় একটা ঘুষি দেয়। এভাবে আমাদের দুইজনের মধ্যে ঝগড়া চলে। একপর্যায়ে বড় ভাই আমাকে পিছন থেকে ধাক্কা দেয়। এতে আমি একটি পাথরের উপরে পরে হাতে আঘাত পাই। ব্যথা যন্ত্রণায় চিৎকার করে কাঁদি। বড় ভাই আমাকে উঠাতে চেষ্টা করে কিন্তু ব্যথায় আমি উঠতে পারছিলাম না। বড় ভাই ভয়ে অনুতপ্ত হয়ে কাঁদো কাঁদো গলায় বার-বার স্যারি ভাই স্যারি বলে আমাকে সমবেদনা জানায়।

আমার এ করুণ অবস্থা দেখে একজন পথযাত্রী দৌড়ে আমার নিকটে আসেন যে নাকি প্রাথমিক চিকিৎসা জানতেন। সে আমাকে তার কোলে নিয়ে বাড়িতে নিয়ে যায় এবং মাকে বলে তোমার ছেলের পা ভেঙ্গে গেছে ডাক্তারেরর কাছে নিতে হবে এখনি। এই কথা শুনে আমি প্রচুর কান্না করি। মাও অনেক মন খারাপ করে। তারা ডাক্তারের কাছে আমাকে নিয়ে যায়। ডাক্তার আমার জামাহাতা কেটে ভাঙ্গা হাতটি দেখে বলল, "খোকা কেঁদো না ভাল হয়ে যাবে"। এক্সরে করলে জানতে পারলাম আমার হাতের কবজি একটু নড়ে গেছে আর দুইটি হাড় ভেঙ্গেছে। ডাক্তার আমার হাতটি প্লাসটার করে দেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় দুইবার অস্ত্রোপচার করার পরও আমার ভাঙ্গা হাতটি আর সোজা হলো না। এই যে দেখ আমার বাম হাত ১৩ সেন্টিমিটার ডান হাত থেকে বেঁকে আছে। বৃদ্ধ বার্ণির প্রতি সহানুভূতি দেখিয়ে ট্রেভর বলল, "দাদু, তোমার ভাঙ্গা হাতের জন্য আমার কষ্ট লাগছে। তোমার ভাঙ্গা হাতের করুণ কাহিনী বলার জন্য অনেক ধন্যবাদ।" বার্ণি বলল, "হ্যাঁ সত্যি অনেক বছর আগে আমাদের দুইভাইয়ের মধ্যে ঝগড়ার কারণেই আমার বাম হাতটি এখন পর্যন্ত বেঁকে আছে।"

জেসন বলল, "তাহলে তুমি এর জন্যই আমাদের ঝগড়া থামিয়ে ছিলে তাই না, দাদু?" তুমি ঠিকই বলেছে দাদু, আসলে কি জানো দাদুরা, যখনই আমি দেখি কোনো ছেলেমেয়েরা ঝগড়া করছে; তখন আমার ভয় লাগে তারাও হয়তো আমার মত আঘাত পাবে। সারা জীবন কষ্ট পাবে। তাই এর জন্য ঝগড়া করা দেখলে আমি থামিয়ে দেয়। তোমাদেরকেও আজকে থামালাম। দাদুরা আজ থেকে সবসময়ই মনে রাখবে রেগে গেলে মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হয়; কখনোই ঝগড়া করতে নেই। কারণ এতে ভাল ফল আসে না। তোমারই এখন বিচার বিশ্লেষণ করো ঝগড়া করা ভাল কাজ কি-না।

বৃদ্ধ বার্ণির কথা ঠিক। রেগে গেলে আমাদের ঝগড়া করতে নেই। কারণ তর্কে জড়িয়ে রেগে ঝগড়া করা কোনো সময়ই মানুষের জীবনে মঙ্গলকর কিছু বয়ে আনতে পারে না॥

সামাজিক রাজনীতি ও দেশীয় খ্রিস্টান সমাজ

চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু

(পূর্ব প্রকাশের পর)

গবেষকের দৃষ্টিতে স্বদেশী খ্রিস্টভক্ত :

গবেষক অবসরপ্রাপ্ত কর্ণেল এ.এস.এম সামছুল আরেফিন, "মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান" বইয়ে লিখেছেন, "একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে ধর্ম, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে প্রায় সকল বাঙ্গালী প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশগ্রহণ করলেও সাধারণভাবে হিন্দু ও মুসলমান এই সম্প্রদায়ের অংশীদারিত্বই সাধারণভাবে প্রকাশিত ও ব্যাপকভাবে পরিচিত। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে এদেশের খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে এবং এদেশে অবস্থিত চার্চগুলো মুক্তিযুদ্ধে ব্যাপকভাবে সহায়তা দান করে, মুক্তিযোদ্ধাদের আশ্রয় ও সেবা দানের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা অতুলনীয়। এদেশে কর্মরত বিদেশী নাগরিক ফাদার মারীও, ফাদার এভেন্স, সিস্টার ইম্মানুয়েল এবং এদেশের সন্তান লুকাস মারান্ডি মুক্তিযুদ্ধে আত্মদান করেন। মাইন বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ষাটোর্ধ্ব সিস্টার ইম্মানুয়েলের দেহকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে উড়িয়ে দেয়া হয়। যোয়াকিম গোমেজসহ বহু খ্রিস্টানকে ধরে নিয়ে তাদের ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চালানো হয়। খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের যুবকরা দেশব্যাপী উপজাতি সম্প্রদায়ের ছেলে-মেয়েদের নিয়ে গড়ে তুলেছিলেন ছোট ছোট গেরিলা দল। ময়মনসিংহে গারো খ্রিস্টানদের ১২০০ জনের দল গঠন, দিনাজপুর জেলায় উড়াও ও সাঁওতালরা গঠন করে ১০০০জনকে নিয়ে এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সুনামগঞ্জ, শ্রীমঙ্গল, জলিলপাড়, জলছত্র, হালুয়াঘাট রাণীখং, হাসনাবাদ, মরিয়মনগর, সাভার, কালিগঞ্জের রাঙ্গামাটিয়া, তুমিলিয়া, নাগরী প্রভৃতি স্থানে ছোট ছোট দল নিয়ে খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের তরুণরা দেশকে মুক্ত করার জন্য সারাক্ষণ যুদ্ধ করে। এছাড়া গোটা দেশের অন্যান্য স্থানে দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গেও এঁরা একত্র হয়ে যুদ্ধে অংশ নেন" *[পৃষ্ঠা নং-৫০৪]*।

মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায় আমরা :

১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারীতে ত্রৈলক্ষনাথ চক্রবর্তীর লেখা, "জেলে তেত্রিশ বছর" পাকিস্তান সরকারের বাজেয়াপ্ত করা বইটি পড়ার সুবাদে, একজন ত্যাগীপুরুষ ও দেশ প্রেমিকের কঠিন পরীক্ষাপূর্ণ জীবনীটি পাঠকরে আমি শেষ করেছিলাম। বইটি আমাকে মুক্তিযুদ্ধের ত্যাগ ও বিনাবাক্যে নেতার নির্দেশ মেনে চলার জন্য আমার জীবনে দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিলো বিধায়, আগরতলায়

পৌছেই প্রথমে ছাত্র নেতাদের খুঁজে বের করলাম। কলেজ টিলায় আবদুল কুদ্দুস মাখনকে না পেয়ে তাঁর দরজায় একটি চিরকুট রেখে শ্রীধর ভিলায় গিয়ে পেলাম আ.স.ম. আবদুর রবকে। রব ভাই কয়েকটি বাক্যে এফ.এফ. ও বি.এল.এফ সম্পর্কে আমাকে ব্যাখ্যা করে বিশ্বাসী, সাহসী, সুস্বাস্থ্যবান এবং শিক্ষিত যুবকদের বাছাই করে বি এল এফ এ পাঠানোর পরামর্শ দেন। পূর্বাঞ্চল প্রধান শেখ ফজলুল হক মনি ভাইর সাথে কাজের মধ্য দিয়েই পরিচিতি হলাম। অতপর, যুদ্ধের পরিস্থিতি পরিদর্শনে যাবার পথে প্রথমে মনি ভাই আমাকে একদিন বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চলে নিয়ে যান। পরে কখনো রব ভাই, কখনো শাজাহান সিরাজ, কখনো স্বপন কুমার চৌধুরীদের সাথে বেশ অনেকবার মাতৃভূমির পবিত্র মাটি কপালে ছুঁয়ে ধন্য হয়েছি। একজন স্বল্প ভাষী কর্মী হিসেবে, মনিভাই আমাকে পছন্দ করতেন এবংমানসিক চাপ থেকে কিছুটা হালকা হতেই হয়তো, তিনি যুদ্ধের পরিস্থিতি নিয়ে আমাকে ছোট খাটো বিষয় সম্পর্কে বর্ণনা করতেন।

বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (বি,এল,এ-ফ)কে মুজিব বাহিনী বলা হতো। কারণ ছাত্রলীগ ও আওয়ামী লীগের ত্যাগী ও বিশ্বস্থ কর্মীরাই কেবল এখানে প্রশিক্ষণ লাভ করার সুযোগ লাভ করেছেন। এ বাহিনীতে অস্ত্র পরিচালনার সাথে কিছুটা রাজনীতি এবং প্রশাসনিক বিষয় দীক্ষা দেয়া হতো। আমাকে খ্রিস্টান যুবকদের নির্বাচন করার দায়িত্ব দিলেও মাঝে মাঝে দু'একজন করে, খ্রিস্টানদের সাথে হিন্দু ও মুসলমান ছেলেকে মুজিব বাহিনীতে প্রশিক্ষণ লাভের সুযোগ করে দেয়ায়, সবার মাঝে আমার বেশ জনপ্রিয়তা ও গ্রহণ যোগ্যতা গড়ে উঠেছিলো। ঢাকা জেলার মুজিব বাহিনী কার্যালয়টি ছিলো অরুন্ধতি নগরের পাশে, বেলতলি এলাকার দারোগা বাবু মজুমদারের বাড়ীর ভাড়াটে বাসস্থানে। গোটা জেলার যুদ্ধ পরিস্থিতি, অবস্থান ও জরুরী দপ্তরের গোপন বিষয়গুলো বেতার যন্ত্রে আমাকে জানানো হতো। ঢাকা জেলা বি.এল.এফ শিবির পরিচালনার ভার আমাকে দেওয়ায় বুভুক্ষা, আহত যোদ্ধাদের রান্নাকরা নিজেদের খাবার খাইয়ে প্রায়ই নিজেকে না খেয়ে কাটাতে হয়েছিলো বিধায়,রক্ত আমাশয়ে আক্রান্ত হয়ে আমার স্বাস্থ্য খারাপ হয়েছিলো। দুর্বল শরীর নিয়ে অজানা অচেনা মানুষের সাথে বিভিন্ন তাবু

পরিদর্শন করে পরিচিতদের সমস্যায় আমাকে বিভিন্নমুখী সাহায্য করতে হয়েছে। নির্ধারিত দলের সাথে নয়, বরং দু'চারজন নেতাকে নিয়ে কখনো দু'দিন, কখনো তিনদিন, এভাবে চারবারে প্রায় পনের দিন আমাকে ভারতীয় সেনা বাহিনীর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের হাতে অস্ত্র পরিচালনার প্রশিক্ষণ নিতে হয়েছে। মেলাঘর, উদয়পুর, হাফলং ক্যাম্পে বেশ কয়েকবার রাত কাটিয়ে ছাত্র নেতাদের সাথে আমাকে স্বসস্ত্র যুদ্ধের কৌশলাদি শেখানো হয়েছিলো। ত্রিপুরা রাজ্যের গভর্ণর এ,এল,ডায়েস ও মরিয়ম নগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ব্রাদার ছিপ্রিয়ান রিচিলের সহযোগিতা এবং পূর্বাঞ্চলের সেনাপ্রধান কর্ণেল বি,কে,কোড়ায়ার সহযোগিতায় নভেম্বর মাসে আমার মাধ্যমে দুইশত মুক্তিযোদ্ধাকে স্বশস্ত্র করা হয়েছিলো।

পরদেশে মানব সেবা :

আগরতলা উপশহর এলাকায় কাশিনাথপুর অবস্থিত। বাস থেকে নেমে আধাপাকা সড়ক ধরে মাইল দেড়েক হাটার পর মরিয়ম নগর ক্যাথলিক ধর্মপল্লী। পাল পুরোহিত কেনাডিয়ান ফাদার জর্জ লেকলিয়ার সিএসসির উদারতার কারণে আমাদের থাকার উদ্দেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের কক্ষগুলোতে রাতে ঘুমাবার উদ্দেশ্যে একটি যুব শিবির প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিলো। অল্প দিনের মধ্যেই মরিয়ম নগরে "কারিতাস ইন্ডিয়া"র একটি ছাত্র-যুব সেবাদলের আগমন ঘটে। ফাদার জর্জের মাধ্যমে ওরা আমার কাছ থেকে কয়েকজন স্বেচ্ছা সেবক চাইলে, আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং খ্রিস্টান ছাত্র কল্যাণ সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক বেনেডিক্ট ডায়েস, মনু বেনেডিক্ট ডি'ক্রুজ, মনিন্দ্র চন্দ্র মন্ডল, সুবাস আব্রাহাম ডি' কস্তা ও আন্তনী কোড়াইয়াকে সাহায্য সংস্থার কাজে নিয়োগ দেওয়ালাম। এদের যাতায়াতের উদ্দেশে একটি জীপ দেয়া হলো এবং হাত খরচ বাবদ মাসে একশো পঁচিশ টাকা করে দেয়া হতো। ভারতীয় কারিতাস একজন ডাক্তার খুঁজছিলেন। দুদিন পরেই ডাঃ বার্ণাড ডি'রোজারিও (এলএমএফ) স্বপরিবারে আমাদের শিবিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ফাদার জর্জকে বলে ডাক্তার বার্নাডের স্ত্রী লীনা গমেজকে নার্স এবং তার কম্পাউন্ডার ফনিন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তীসহ ডাক্তার বার্ণাডকে ক্যাম্পের চিকিৎসার কাজে লাগিয়ে দেয়া হলো। ডাক্তার বার্ণাডের জীপ চালানোর জন্য স্থানীয় খ্রিস্টান চালক রবার্ট ডি'ক্রুজকে নিয়োগ দেয়া হলো। ড্রাইভার সাহেবের খাম খেয়ালির জন্য একবার দুর্ঘটনায় পাহাড়ি রাস্তা থেকে পড়ে গিয়ে পরিবারের সবাইকে আহতাবস্থায় যখম হয়ে হাসপাতালে আশ্রয় নিতে হয়েছে। কুঞ্জবন সরকারী হাসপাতালে তাদের দেখতে গিয়ে গোল্লা ধর্মপল্লীর চিকিৎসাধীন ইঞ্জিনিয়ার আগষ্টিন রিবেরুকে পেলাম। সিলেটে পাক-বাহিনীর ব্রাশ ফায়ারে, তার দুইপাই ভেঙ্গে গিয়েছিলো। তিনি পাপ স্বীকার-কম্যুনিয়ন চাইলে ফাদার জর্জকে পাঠিয়ে আহত ইঞ্জিনিয়ার আগাষ্টিনদাকে মনোবল বৃদ্ধি ও আত্মশক্তি সঞ্চয়ে সহযোগিতা করা হয়েছিলো।

ছড়িয়ে পড়া শত্রুদের প্রতিরোধ :

বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি গ্রাম যখন গেরিলাযুদ্ধে আন্দোলিত, প্রতিশোধের হীন আক্রোশ বশত: আতঙ্কিত পাকবাহিনী অতর্কিত হামলায় বাংলাদেশের যত্রতত্র আক্রমণ করে সন্ত্রাসের রাজত্বে পরিণত করে তোলে। যোদ্ধাহত গ্রাম বাংলার তথ্য বিবিসি ভয়েস অব আমেরিকা, আকাশ বাণী ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে বিশ্বসমাজের কাছে প্রচার করে বিপন্ন বাংলাদেশের সংবাদ প্রচার করা হতো। প্রাণভয়ে আতঙ্কিত নীরিহ মানুষ নিজ দেশের সংবাদ জানার জন্য তীর্থের কাকের মতো বেতার বার্তা শোনার অপেক্ষায় চব্বিশ ঘন্টা সম্ভাব্য নিরাপদ এলাকায় অপেক্ষায় থাকতেন। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে এম,আর, আখতার মুকুলের ব্যাঙ্গাক্তপূর্ণ যুদ্ধের ঘটনা শোনার অপেক্ষায় সারা বাংলার মানুষ খন্ড খন্ড দলে জড়ো হয়ে বসে থাকতেন।

কৃষক, শ্রমিক, মেহেনতি মানুষের ছদ্মবেশী বিচ্ছু মুক্তিযোদ্ধাদের আচমকা আক্রমণের সংবাদ তখন বিশাল বিজয়ের আনন্দে সাধারণ মানুষকে পুলকিত করেছে। পথে, ঘাটে, মাঠে সর্বত্র দলবদ্ধ মানুষ স্বাধীনতার নামে আশার আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম পর্যায়ে দুইএকজন পাঞ্জাবী সৈন্যের মৃত্যুই যেন বাঙ্গালির মনে এ্যাটম বোমার বারুদের গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছে। তথাকথিত ধর্মীয় সংখ্যালঘু খ্রিস্টান বসতিস্থানগুলো, অতীতে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গায় নিরাপদ আশ্রয়স্থলে পরিণত হলেও ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মুক্তিযুদ্ধের দামামা সকল বাঙ্গালি, তথা সীমান্ত এলাকার আদিবাসী খ্রিস্টান ধর্মপল্লীগুলোর নিরাপত্তা ব্যবস্থায় ছিলো সম্পূর্ণ শূণ্য। পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকা অতিক্রম করে সর্বহারা আদিবাসী ও বাঙ্গালিরা ভারতে প্রবেশ করত: বিভিন্ন শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করে প্রাণে বেঁচে গেলেও দীর্ঘ নয় মাস তারা শূণ্য হাতে খেয়ে না খেয়ে আত্মরক্ষা করেছেন। এক কোটি মানুষ ভারত সরকারের করুণায় দীর্ঘ নয় মাস পরভূমিতে আশ্রিত জীবন অতিবাহিত করেন।

মানবিক কারণে শরণার্থীদের সেবায় বিভন্ন সরকারী-বেসরকারী সংস্থা সর্বহারা মানুষের প্রতি সেবার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। স্বনামধন্যা মাদার তেরেসাসহ খ্রিস্টান মিশনারীদের সেবাদান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালিন ঐতিহাসিক ভূমিকায় অবতরণ করেছে। দেশের অভ্যন্তরে সৎসাহসী সাধু পুরুষ স্বর্গীয় আর্চবিশপ টিওটনিয়াস অমল গাঙ্গুলী সিএসসি'র নির্দেশে যোদ্ধাহত বাংলাদেশের প্রতিটি ধর্মপল্লী নিরীহ হিন্দু ও গৃহহারা খ্রিস্টান জনতার আশ্রয় শিবিরে পরিণত হয়েছিলো। এমতাবস্থায় তথাকথিত অরাজনৈতিক খ্রিস্টান পল্লীতে জনশূণ্যতার কারণে পাকিস্তান বাহিনীর সদস্যরা অবাধে লুটপাট করে পেট পুজা দিতে গৃহপালিত পশু ছিনিয়ে নিয়েছে। বিশেষতঃ ঢাকার অদূরে পূবাইল- আরিখোলার রেল সড়কের দু'ধারে অবস্থিত খ্রিস্টান-হিন্দু-মুসলমানদের বেশ কয়কটি গ্রাম জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করে দিয়েছিলো। নল্‌ছাটা, লুদুরিয়া ধনুন, দড়িপাড়া, বান্দাখোলা, তুমিলিয়া এবং সর্বশেষ পর্যায়ে এসে রাঙ্গামাটিয়া গ্রামটি তারা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। জনশূণ্য গ্রামগুলোতে লুট করতে আসা সেনাসদস্যরা, নিজগৃহ পাহারায় থাকা মানুষদের মুক্তিযোদ্ধা সন্দেহে অযথা গুলি করে হত্যা করেছে। যুদ্ধের প্রথমার্ধে অরাজনৈতিক খ্রিস্টভক্তদের গলায় ক্রুশ অথবা রোজারী মালা (তজ্‌বী) সাথে থাকায় তাৎক্ষণিকভাবে বেঁচে গেলেও মুক্তিযোদ্ধাদের প্রায় সবারই গলায় অহরহ ক্রুশ পাওয়া গেলে, গোটা দেশের খ্রিস্টান ভক্তগণও নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়েন। শেষ অবধি খ্রিস্টান যুবকরা বাধ্য হয়েই দলে দলে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন।

অতঃপর, লালমনিরহাট ব্যাপ্টিস্ট মিশন এলাকায় লুটপাট, ধর্ষণ, হত্যা এবং অগ্নি সংযোগ করা হয়। নাটোরের বনপাড়া খ্রিস্টান পল্লীতে ইটালিয়ান ফাদার অ্যাঞ্জেলো ক্যানটনের আশ্রয়ে থাকা হিন্দু

শরণার্থীদের তোলে অন্যত্র নিয়ে হত্যা করা হয়। পাবনার চাটমোহর এলাকার মূলাডুলি, ময়নার মাঠ, মথুরাপুর ধর্মপল্লী, রাজশাহীর রুহিয়ার শাওতাল এলাকা, খুলনার মংলা এলাকা, দিনাজপুর শহরে বাঙ্গালি-আদিবাসী এলাকা, বরিশালের পাদ্রিশিবপুর, নারিকেল বাড়ী, ময়মনসিংহের হালুয়াঘাট, বালুচড়া, বিড়িশিড়ি, টাঙ্গাইলের জলছত্রে কাদির বাহিনীর গারো সদস্যদের স্বশস্ত্র যুদ্ধ করেও মুক্তিযোদ্ধাদের সরকারী তালিকায় ৯৫% ভাগই নাম লিপিবদ্ধ হয়নি। চট্টগ্রাম শহরের অভ্যন্তরে এবং বিভিন্ন গ্রামে অ্যাংলো বাঙ্গালি খ্রিস্টভক্তদের অবদান উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রচনার পিছনে ছিলেন বিশপ যোয়াকিম রোজারিও সিএসসি, সেন্ট স্কলাস্টিকাস গার্লস্ স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সিষ্টার জীতা মড্ রিবেরু আরএনডিএম যিনি যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে পৌঁছলে, জেনারেল যাকব অরোরা পর্যন্ত সম্পর্ক রক্ষা করে মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা করেছেন। বুদ্ধিজীবি হত্যা তালিকায় তাঁর নাম থাকায়, সরকারের আহ্বানে সভাস্থলে তিনি উপস্থিত হলে, পাকিস্তানী খ্রিস্টান মেজর তাঁকে বাধা প্রদান করেন বেং "কনভেন্টে" ফেরত পাঠিয়ে সেদিন প্রাণে বাঁচিয়েছিলেন।

২৬ নভেম্বর রাঙ্গামাটিয়ার যুদ্ধঃ

রাঙ্গামাটিয়া থেকে শিক্ষিত এবং সাহসী বিএলএফ বাহিনীর বেশ কয়েকজনের নেতৃত্বে গ্রামটিকে মুক্তিবাহিনীর প্রকাশ্য ঘাটিতে পরিণত করা হয়েছিলো। পাঞ্জাবীদের যাতায়াতে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে ২৫ নভেম্বর, বান্দাখোলা - দড়িপাড়ার সংযোগস্থল, আশ্করের বাড়ীর পশ্চিমে দড়িপাড়া রেলসড়কের পুলটি ভেঙ্গে দেবার বুদ্ধিতে এলাকাবাসী কোদাল নিয়ে সড়ক কাটতে আরম্ভ করলে, মিলিটারী ভর্তি একটি ট্রেন এসে এলোপাথারি গুলি বর্ষণ করে। সেদিনের আক্রমনে গ্রামের বেশ কয়েকজন আহত হয়েছিলেন। পরের দিন ২৬ নভেম্বর, একই সময় ধরে পূর্বাইল থেকে কামান দাগিয়ে পাক সেনারা রাঙ্গামাটিয়ায় আক্রমণ চালায়। পাক সেনারা পূর্বদিক থেকে বিশাল বাহিনী নিয়ে পায়ে হেঁটে গির্জায় গিয়ে পৌঁছে। মার্কিন যাজক ফাদার চার্লস হাউজার সিএসসি পালিয়ে পাটক্ষেতে আশ্রয় নেন। পাকিস্তানীরা পুরোহিতকে না পেয়ে সমবায় ঋণ দান সমিতির নথিপত্র তছনছ করে এবং গির্জায় আঘাত করে গ্রামে ঢুকে পড়ে। গ্রামের মানুষ স্নানাহারে ব্যস্ত এমন সময় মাত্র ২৫-২৬ জন মুক্তিযোদ্ধা কামানের বিরুদ্ধে এলএমজি চালালে গ্রামটির উপর বিমান বাহিনীর আক্রমন আরম্ভ হয়।

সেদিনের যুদ্ধে রাঙ্গামাটিয়া গ্রামে ১৩৭টি বাড়ী অগ্নিদগ্ধ করা হয়। যুদ্ধশেষে জানা যায় মোট ১৭জন নিহত এবং ১৪জন আহত হলেন। দুপুরে গ্রামবাসীরা স্নানাহারের প্রস্তুতি নেবার সময়, পাকবাহিনীর আক্রমনে কয়েক ঘন্টার মধ্যে গ্রামটি পুড়ে ধ্বংস হয়ে গেলো। মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে রাঙ্গামাটিয়া খ্রিস্টান পল্লীটি হয়ে উঠলো ঐতিহাসিক পটভূমিকার এক উল্লেখযোগ্য ঘটনাস্থল।

পাকিস্তানীদের আত্মসমর্পন ও বিজয়ানন্দ :

দীর্ঘ নয়মাস অবধি মুক্তিপাগল বাঙ্গালির গেরিলা হামলা ও খন্ড যুদ্ধ শেষে, মিত্র বাহিনী ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ আক্রমন আরম্ভ হলে ৪ ডিসেম্বর, ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তান আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৬ ডিসেম্বর, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান করেন। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পরাশক্তি পাকিস্তানী বাহিনীর উপর মুক্তিবাহিনীর সাথে মিত্রবাহিনী প্রতিরক্ষামূলক ত্যাজদীপ্ত যুদ্ধ চালিয়ে যায়। ইতিমধ্যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং তাজউদ্দিন আহমদ যশোরে স্বক্রিয় যুদ্ধে অবস্থান নেন। ভারতের চীপ অব্ স্টাফ জেনারেল মানেক শ'পূর্ব রণাঙ্গণে যুদ্ধারত পাকিস্তানী সৈন্যদের আত্মসমর্পনের আহ্বান জানান।

১০ ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনীর সমন্বয়ে যৌথ কমাণ্ডকে মিত্র বাহিনী নামে ঘোষণা ও প্রচার করা হয়। ১৩ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকাকে, চতুর্দিক থেকে ঘিরে অবরুদ্ধ রেখে পাকিস্তানকে আত্মসমর্পন করার বার্তা পাঠানো হয়। ১৫ তারিখে হানাদার বাহিনী প্রধান লে জে নিয়াজী, মানেক শ' এর কাছে আত্মসমর্পন বার্তা পাঠালে ১৬ ডিসেম্বর, বিকেল ৪টা ৩১ মিনিটে, মিত্র শক্তির কাছে ঐতিহাসিক রাজনৈতিক প্রান্তর সোরাহ্উর্দি উদ্যানে, আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মসমর্পন ও দলিলে স্বাক্ষর করা হয়।

কুমিল্লা জেলার নবীনগর থানার অস্থায়ী তাবুতে অবস্থান নিয়ে, আমরা "ঢাকা জেলা মুজিব বাহিনী ও মুক্তি বাহিনী"র সদস্যরা বাংলাদেশ বেতারে ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, পাকিস্তানীদের আত্মসমর্পণ বার্তা শুনে, বিজয়ের বিজয়ানন্দে আমরা সবাই মুক্তাকাশে স্বতস্ফূর্ত বুলেট নিক্ষেপ করতে আরম্ভ করি। কয়েক মূহুর্তেই স্বাধীন বাংলাদেশের উল্লাসিত বাতাস বিজয়ানন্দে মাতাল হয়ে পড়ে। মহান মুক্তিযুদ্ধে আমরা ঐতিহাসিক বিজয় ছিনিয়ে নিয়ে বাংলাদেশকে সেদিন সত্যি শত্রুমুক্ত করলাম এবং স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হলাম। স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রজন্ম অবহেলায় হারিয়ে যাবার কালে, সরকার মহান বীরদের সম্মান দিয়ে আমাদের ধন্য করেছেন বটে! খ্রিস্টান সমাজ নিজস্ব মুক্তিযোদ্ধাদের মূল্যায়ন করতে অদ্যাবধি ব্যর্থ। অবহেলিত, অসুস্থ এবং ভুক্তভোগীদের অভিযোগে এমনটিইশোনা যায় বটে! মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় পঞ্চাশ বর্ষপূর্তকালে বীর মুক্তিযোদ্ধাদের পূনর্বাসন প্রকল্প গ্রহণ করে মন্ডলি নিয়ন্ত্রিত উন্নয়ন সংস্থাগুরোর পক্ষ থেকে যথাযথ মর্যাদা প্রদানে এর দ্রুত সমাধান জরুরী এবং অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বলে সবাই মনে করছেন।

তথ্যসূত্র:

১। সাপ্তাহিক প্রতিবেশী: "স্বাধীনতা সংগ্রামে খ্রীষ্টান সমাজের অবদান" চিত্ত ফ্রান্সিস রিবেরু; ২ জুলাই, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ।

২। দৈনিক জনকণ্ঠ: "পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ" মোস্তাফিজুর রহমান টিটু: ১৯ মার্চ, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।

৩। দৈনিক সংবাদ: "আজই সেই ১৯ মার্চ; গাজীপুরে সংগঠিত হয়েছিলো এদিন প্রথম সশস্ত্র প্রতিরোধ" মুকুল কুমার মল্লিক: ১৯ মার্চ, ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ।

৪। বাংলাদেশে কাথলিক মণ্ডলী: যেরোম ডি' কস্তা: প্রকাশকাল: আগস্ট, ১৯৮৮ প্রতিবেশী প্রকাশনী, ৬১/১, সুবাস বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার, ঢাকা।

৫। মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান: এএসএম সামছুল আরেফিন, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১১৪, মতিঝিল বা/এ, পোষ্ট বক্স-২৬১১, ঢাকা-১০০০।

(সমাপ্ত)

যাওয়া

রবার্ট চিরান

'শেষ পর্যন্ত কি চাকুরীতে যোগদান করছো?' - জিজ্ঞেস করে অলক।
নীতা একটু খাপছাড়া বিরক্তির সুরে উত্তর দেয়-
- নয় তো কি !
- ও আচ্ছা! কতক্ষণ চুপ থেকে আবার অলক শুধোয়-
- তুমি থাকবে কোথায়? বাসা ঠিক করেছ?
পূর্বের চেয়ে আরো একটু তার সুরে নীতা উত্তর দেয়-
- ঠিক করিনি। তবে ঠিক হয়ে আছে।
- হয়ে আছে মানে! অলক একটু আশ্চর্য হয়।
- মানে হলো- যে অফিসের চাকুরী করবো সেই অফিসেই থাকা খাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে।
- তাই! কিন্তু সেখানে তুমি একা থাকবে? উদ্বিগ্নের সাথে অলক প্রশ্ন করে। নীতা তার প্রতিউত্তরে জবাব দেয়-
- তাই বৈকি!
- সে আবার কেমন কথা! এ যে বিলক্ষণ নিজের বিপদ নিজে ডেকে আনা! এরকম তো কথা ছিল না। চাকুরী দাতা তো এ রকম কিছু আগে বলেনি! তুমিও তো আমাকে সে রকম কিছু বলোনি!
- কেন? আমি কি একা থাকতে পারবো না। আর একা থাকা কী অন্যায় কিছু?
- নাহ! অন্যায় হবে কেন? কিন্তু তোমার একটা বংশ মর্যাদা আছে, আত্মমর্যাদার ও ব্যক্তিত্বেরও ব্যাপার আছে নাকি?
- সেই বংশ মর্যাদা আমাকে ভাত দেয় নাকি কাপড় দেয়? আমার চাই টাকা টাকা বুঝেছ কিছু?
- আত্মমর্যাদা ও ব্যক্তিত্বের ব্যাপারটা শুধু ব্যক্তিরই ব্যাপার বটে!

অলক আর কথা বাড়ায় না। নীতার কথা-বার্তা শুনে তার কোন কথা মুখ দিয়ে বের হল না। না হওয়ারই কথা। কারণ, এ যে রীতিমতো পুরুষ নির্যাতন! এতদিন সে শুনে এসেছে নারী নির্যাতনের কথা যা পুরুষ কর্তৃক করা হয়। কিন্তু আজ তার ভুল ভেঙ্গেছে। সমাজে পুরুষ নির্যাতনও হয়। বস্তুত অলক চেয়েছিল সংসার জীবনে তাদের একটা সুখী-সমৃদ্ধ পরিবার হবে। পরস্পরের সব বিষয়ে শেয়ার হবে, প্রত্যেকের অংশগ্রহণ থাকবে, যেখানে উভয়ের ভাল বোঝাপড়া থাকবে আর সর্বোপরি থাকবে পরিবারে শান্তির পরশ। কিন্তু বাস্তবতা বিপরীত ফল নিয়ে হাজির। সংসার আর কতদিনেরই বা তারা করেছে? মাত্র তো তিনটি বছর হলো। এরই মধ্যে সব সুখ হাওয়া হয়ে গেল? সুখ কি টাকা দিয়ে কেনা যায় তাহলে? মনে-মনে প্রশ্ন করে অলক। তার প্রশ্নের উত্তর সে আর খুঁজে পায় না। অগত্যা সে পূর্বের যে কাজ সেই লেখালেখিতেই মনোযাগটা বাড়িয়ে দিল। জানে এখন তর্ক করে কোন লাভ নেই। সময় অপচয় আর মানসিক কষ্ট পাওয়া ছাড়া কিছুই সেখানে পাওয়া যাবে না। অন্যদিকে নীতা তার সেই দাম্ভিকতা বজায় রেখে নিজেকে আয়নার সামনে সাজানোর বদ্ধ প্রয়াস পাচ্ছে।

এখন প্রায় বিকেল ৪টা। অনেক ক্ষেত্রে সে পুরনো অভ্যেসটার চর্চা করতে প্রয়াস পেলেও তা আর হয়ে উঠে না। পারিপার্শ্বিক সময় বা পরিবেশ যে সেরকম আর নেই। বর্তমান ডিজিটাল যুগে এসে সে যেন খেঁই হারিয়ে ফেলছে। বর্তমানের সাথে নিজেকে মানিয়ে নিতে বা তার সাথে তাল মিলাতে পারছে না। কোথাও যেন ভুল হচ্ছে তার। সে অনেক ক্ষণ তার গল্পের প্লট হাতড়িয়েও কোথাও কোন সময়োপোযোগী প্লট খুঁজে পেলে না। মিছামিছি কাগজে আঁকিজুঁকি করল। রেখা টানল, মানুষ, গরু, গাছ, ঘর-বাড়ী, নদী, নৌকা, গাঁয়ের দৃশ্য আঁকল। আবার কাঁটল, আবার শুরু করল। কিন্তু কিছুই হল না। বরং তার মানসিকতায় একটা চিন্তার ভাঁজ দেখা গেল। কতক্ষণ বাইরে বিকেলের করোজ্বল আর তার প্রতিফলিত আবেগময় অথচ নিরানন্দতায় ভরা বিকেলের দুরের সেই যে রেখা দিগন্তের প্রান্ত স্পর্শ করেছে, তা অলককে আকর্ষণ করতে পারল না। সেই দিগন্ত রেখা, যে আকাশ স্পর্শ করেছে, সেখানে আকাশ ও দিগন্তের একটা অদৃশ্য মিলনদৃশ্য প্রকৃতিকে দিয়েছে আর এক মাত্রা। সেখানে কারোর প্রবেশাধিকার নেই, দ্বিতীয় কোন অস্তিত্বেরও বালাই নেই; একমাত্র অলক ছাড়া। জয়-পরাজয়ের কোন দৌড় নেই। পরাজিত হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই, নেই কোন বেদনার লেশমাত্র। কষ্টাকষ্টের বিষয় নেই। সেখানে শুধু অনাস্বাদিত সুখ আর সুখ। কি অপরূপ সেই দৃশ্য! অলক এক মুহূর্তে নিজেকে সেখানে হারিয়ে ফেলল।

এদিকে নীতা তার কাজ সেরে তার টেবিলের কাছে এসে হঠাৎ করেই তাকে আর্শ্চয করে বললে, এই! দেখেতো আমি কেমন সেজেছি?
অলক নীতার এই অদ্ভুত প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। সে বিমূঢ় হয়ে নীতার দিকে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। অলক দেখল যে, নীলাম্বরী শাড়ীতে বেশ ভালই মানিয়েছে নীতাকে। বহুদিন যাবৎ নীতাকে সে এই বেশে দেখেনি। আর সেই সুযোগও বা কোথায়? সেই চিরাচরিত পরিবেশগত অভাব, মন-মাসসিকতা আর হাল-চাল তাতে তাল মিলাতে গিয়ে অলকেরও সেই চিন্তা করার বা নীতারও সেখানে মনোযোগ দেয়ার ফুরসত কোথায়? তার মানে বর্তমান ডিজিটাল যুগে যা করা হয় না, যা বর্তমানে বেমানান, সেই বিষয়টার সাথে তাল মিলায়েই তা করেছে নীতা। এতদিন নীতা শুধুই সালোয়ার-কামিজ পড়েছে, ভুলেও কোনদিন শাড়ী পড়েনি। সেই যে বিয়ের সময় একবার লালচে খয়েরী শাড়ীটা সে পড়েছিল; সেই থেকে সে আর শাড়ী পড়েনি। গ্রামের সেই চিরাচরিত সাজ যা আসলেও আধুনিক ডিজিটাল সমাজে বেশ বেমানান। আধুনিকার বদৌলতে সেই অকৃত্রিম সংস্কৃতির ছোঁয়া হারিয়ে গেছে কবে মন থেকে। অলক যতবার নীতাকে সেই কথা বোঝাতে চেয়েছে, ততবারই নীতা সেই বিষয়টা এড়িয়ে গেছে। কিংবা গুরুত্ব দেয়নি। এই নিয়ে তাদের মধ্যে মাঝে-মাঝে বাক্‌যুদ্ধ হয়েছে। হার অলককেই মানতে হয়েছে। নীতার রুচিবোধে কোনদিন হাত দেয়নি বা জোর করে তার লালন করা বিশ্বাসটা নীতার উপর চাপিয়ে দিতে কখনও চেষ্টা করেনি। সংসারের হাল ধরতে গিয়েও অলক সমঝোতার পথ বেঁছে নিয়েছে। সংসারকে সহজ পথে পরিচালিত করতে কত কিছুই তো মনুষকে ছাড় দিতে হয়। নিজের আশা-আকাঙ্খা, চাওয়া-পাওয়া কত কিছুই তাদের জীবনের কাছ থেকে হারিয়ে গেছে তাদের গভীর সংস্কৃতির শিকর থেকে। নীতার নিজস্ব রুচিবোধ বা একান্ত বিশ্বাসে বা যুগের হাওয়ার সাথে তাল মিলাতে নীতার ব্যক্তিত্বকে প্রাধান্য দিয়েছে। তাই সংসারে কোনদিন কোন বিষয়ের উপর তাদের মাঝে অবিশ্বাসের জন্ম হয়নি। আত্ম-মর্যাদাবোধেও আঘাত আসেনি। কিন্তু তাদের সংসারে একটু আধটু অর্থনৈতিক সংকট গাঢ় থেকে গাঢ় হয়ে উঠছিল। মাঝখানে তাদের জীবনে একটি ঘটনা যা খুবই কষ্টদায়ক ব্যাপার ঘটে গেছে। যা তাদের সংসার জীবনে অন্ধকারের ছায়া ফেলেছে। তিন বছরে যে সুখ, যে শান্তিময় জীবন তাদের ছিল, সেই সব দিনের জন্য তাদের কোন আফসোস না থাকলেও আজ সেইসব দিনগুলিই ফিরে এসেছে অভিশপ্ত হয়ে। বস্তুত: তিন বছরে কোন সন্তান তাদের জীবনে আসেনি। বহু পরীক্ষা নিরীক্ষা করেও তাদের ফল শুণ্যই থেকে গিয়েছে। সেই সব শুণ্য হাহাকার ব্যাপারগুলো বোধহয় তাদের সেই বিবাহিত জীবনের সেই সব সুখগুলো কেড়ে নিয়েছে। নীতার বিবাহিত জীবনের সমস্ত সুখ কেড়ে নিয়েছে। বস্তুত: তাদের বিষয়টা একই এবং উভয়ই একই কষ্টের সমব্যথী।
নীতা তার প্রশ্নের উত্তর না পেয়ে আবার তাকে তাগাদা দিলে, কই কিছুই তো বললে না।
সেই মুহূর্তে অলক হাসবে নাকি কাঁদবে তার কোন জুটসই উত্তর খুঁজে না পেয়ে মুচকি হাসি নিয়ে অপলক চেয়ে থাকল নীতার তোল খাওয়া গালের উপর। আর মনে একটা ছোট্ট দুষ্টুমীর ঢেউ খেলে যাচ্ছে তা বিলক্ষণ অলক বুঝতে পারছে। কিন্তু মুখে কিছুই বলতে পারল না। এ যেন অল্প সুখে কাতর অধিক সুখে পাথরের মতো দশা। অলক জানে যে নীতার কোথায় কোথায় দুর্বলতা আর কখন তার মনটা প্রসন্ন থাকে। এই মুহূর্তে তাকে চটিয়ে দেয়াটা তার জন্য বুদ্ধিমানের কাজ হবে না ভেবে সে নীতার এমন আচরণের কোন অভদ্রসুলভ প্রতিক্রিয়া না দেখিয়ে নিরবেই তার পরনের সাজ দেখে পুলক অনুভব করল আর এক হেচ্‌কা টানে

নীতাকে তার দিকে টেনে নিলে নিজেরে কাছে আর আদর-সোহাগে তাকে ভরিয়ে দিলে। অর্থাৎ পরিস্থিতিকে সামাল দেয়ার জন্য যা করা দরকার সেই রকম! এবং বললো-

- তুমি যদি চাকরী করতে চলে যাও, তাহলে আমি একা এখানে কি করবো বলো?
- কেন? তুমি দিনে একটা করে চিঠি দিবে!
- এখন কি আর সেই দিন আছে যে তোমাকে চিঠি লিখব?
- ও তাইতো! এখন যে ডিজিটাল যুগ চলছে! তাহলে তো আরো ভালই হলো যে তোমাকে প্রতি মুহূর্তে দেখতে পাবো। কি বলো?
-তুমি একা থাকতে পারবে তো!
-আলবৎ পারবো।
- কিন্তু আমি একা থাকতে পারবো না।
-আজকাল কি যোগাযোগের কোন সমস্যা আছে? তোমার এনড্রইড মোবাইল তাহলে কেন রয়েছে?
- তা আছে বটে! কিন্তু সেটা দিয়ে কী -----
- এ নিয়ে কোন চিন্তা কর না তুমি। আমি ব্যবস্থা করবক্ষণ!
- তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে?
- এটা নিয়ে তুমি ভেবনাতো!
-হ্যাঁ। তুমি ব্যবস্থা করবে বৈকি। এভাবে সংসার চলে?
-চালাতে হবে, চালাতে হয় বুঝেছ?
-হুম্!
-তাহলে তুমি আমার মতে একমত হয়েছো?

অলক এর কোন উত্তর দিলে না। চুপচাপ জানালার অপাশে ছোট-ছোট ছেলেমেয়েরা যেখানে বেশ খেলায় মেটে উঠেছে-সেদিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে দীর্ঘ নিস্বাস ফেলল অনিতার অজান্তে। অনিতা তা টেরও পেলে না। দু'জনই চুপচাপ অনেকক্ষণ বসে থাকল। এরপর বেশ অনেকক্ষণ কেটে গেছে। অলক প্রায় বিষয়টি ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু অনিতা সেই চাকুরী স্থলে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়ার বিষয়ে আবার স্মরণ করিয়ে দিলে। অলকের আশঙ্কা- আবার সেই একই কাহিনী হবে নাতো! অলকের মনে সন্দেহ আর দ্বিধা যেন আর কাটতে চাইছে না। কিন্তু নীতা যে নাছোড়বান্দা! উপায়ন্তর না দেখে অলক নীতার চাকুরীতে যাওয়ার বিষয় নিয়ে কোন কথা বললও না আবার নাও করল না। একদিকে তার প্রেস্টিজের ব্যাপার অন্যদিকে নীতার জেদ আর সমাজ। ক্যালেংকারী আর অনিশ্চিত ভবিষ্যত তাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। বিষন্নতায় ভরে গেল তার মনটা। কোন কিছুতেই তার মন বসল না। কোন কাজও করলে না আবার অনিতাকেও তার মনের কথাটা বলতে পারলে না। শুধু অপেক্ষায় অপেক্ষায় মনটা তার ভার ভার মনে হলো। অগত্যা অলককে ছাড় দিতে হচ্ছে অনিতাকে। কারণ, তাকে ধরে রাখার মতো এই মুহূর্তে অলকের হাতে কোন অস্ত্র নেই বা সেই অবস্থায়ই নেই।

মনের সাথে অনেক যুদ্ধ করে অলক ঘর থেকে বের হলে। এক হাতে অনিতার ব্যাগ আর অন্য হাতে সেই এন্ড্রয়ইড মোবাইল। যে মোবাইলে অনিতা তাকে ভিডিও কল করবে এবং সেখানে অলক তার ছবি দেখতে পাবে। এ যে কী দুঃসহ আর কষ্টদায়ক অলক ছাড়া তা কে আর বোঝে!। পাশাপাশি তবুও যেন কত যোজন যোজন মাইল দূরত্ব, কত তফাতে তাদের দুজনের অবস্থান এই মুর্হূতে! কেউ কাউকে চেনে না যেন! অলক অনেক দূর পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিয়ে দিলো। অনিতা সেই রিক্সায় উঠে অজানা কোন গন্তব্যে চলে যাচ্ছে। আর অলক আস্তে আস্তে অনিতাকে বিদায় জানিয়ে ফিরে এলো শুন্য হাতে! তার মনে হল সমস্ত পথ যেন তাকে ব্যঙ্গ করছে! প্রকৃতি যেন তাকে বিদ্রুপ করছে! বিস্ফারিত ঘরে শূণ্যতার হাহাকার! কেউ থাকে না, সবাই চলে যায়। কেউ সুখ স্মৃতি রেখে যায় আবার কেউ দুঃখের স্মৃতি রেখে যায়। যা একান্ত ভালবাসার মানুষের জন্য নিতান্তই প্রগাঢ় ও গভীর অথচ হাল্কা, দোসর। সেই স্মৃতিই মাঝে-মাঝে হয়ে উঠে মানুষের শেষ অবলম্বন। যা অনিতা অলককে দিয়ে গেল এই মুহূর্তে। রবি ঠাকুরের ভাষায়- "এই পৃথিবীতে কে কার।" বস্তুত: অলকের জীবনের শেষ অধ্যায়টুকু নিংড়ে অনিতা চলে গেল সকল বন্ধন ছিন্ন করে; সে কোন অজানা অনিশ্চয়তার দিকে অলককে ফাঁকি দিয়ে তা কে জানে? অলক নিজেও জানে না॥

২০তম মৃত্যু বার্ষিকী

তোমরা আছ আমাদের হৃদয়ে

২৩তম মৃত্যু বার্ষিকী

প্রয়াত বিচিত্রা রোজলিন গমেজ
জন্ম : ২৯ অক্টোবর, ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৪ মার্চ, ২০০১ খ্রিস্টাব্দ

তোমরা কেমন আছ? তোমাদের খুব দেখতে ইচ্ছে করছে। এই পৃথিবীর পান্থশালায় আমরা শত দুঃখ কষ্টেও শুধুমাত্র তোমাদের স্মৃতি নিয়ে বেঁচে আছি। তোমাদের কথা মনে হলে প্রাণ বারবার কেঁদে ওঠে। এ জগৎ সংসারে তোমাদের সুন্দর জীবন আদর্শের গুণাবলী আমাদের নিত্য দিনের চলার পথের পাথেয়। নিশ্চয়ই তোমরা বাবা-মেয়ে স্বর্গে প্রভুর সাথে সুখে আছ। স্বর্গ হতে প্রতিনিয়ত তোমরা আমাদের জন্যে প্রার্থনা করো, আমরা যেন তোমাদের জীবনের সততা, ন্যায়পরায়ণতা, কর্মঠ ও বিশ্বস্ততা এবং সুন্দর ভালোবাসাপূর্ণ জীবন-যাপন করতে পারি।

শোকার্ত পরিবারের পক্ষে
স্ত্রী : শিশিলিয়া গমেজ
ছেলে ও ছেলে বউ : দিলীপ-পুষ্প, অনুপ-সম্পা, অসীম-চামেলী ও ব্রাদার রিপন সিএসসি
মেয়ে ও মেয়ে জামাই : সুচিত্রা-হেনরী, সুমী-অপু এবং ভুবন
নাতি-নাতি বউ : জনি-শশী, নিবিড়, অর্পণ ও অনুরুদ্ধ
নাতিন ও জামাই : হ্যাপী-অনিক, কিশোরী-সুজন, বিন্দু-রেক্সি, বৃষ্টি-অনিক, অন্তী, অর্থী, নদী, অর্না, রিমঝিম ও অরিন।
পুতিন : প্রান্তর, সুর, অনয়া, আরিয়া
তুমিলিয়া ধর্মপল্লী

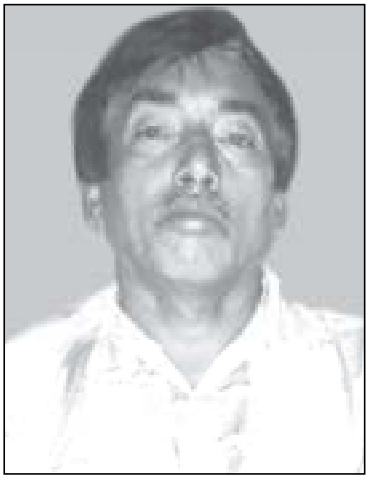

প্রয়াত যোসেফ গমেজ
জন্ম : ৪ এপ্রিল, ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১২ মে, ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দ

বিপ্র/১২৩/২১

যিশুর অপেক্ষা
নোয়েল গমেজ

হে যিশু যখন দেখি
তখন মনে হয় তুমি,
ক্রুশ থেকে নেমে,
আসবে সবার মাঝে।
আলোকিত করবে
সবার হৃদয় ও মন,
পাপময় এই জীবনে,
নিয়ে আসবে সুন্দর সকাল।
যেখানে পাখীরা গান গেয়ে,
উঁড়ে যাবে বিশাল আকাশে,
নদীর কূল-কূল শব্দে,
ভরে যাবে মাঝির মন।
সেই নৌকাতে থাকবে-
দুঃখের দু'টি মানুষ...
তাদের চিন্তা-ভাবনা হবে
সবাইকে নিয়ে।
তাদের প্রার্থনা হবে শুধু,
মানব-সন্তানের সেই যাতনা-ভোগ,
এবং মানব-সন্তানের সেই অপেক্ষা,
যা মনে রাখবে, মানুষ চিরকাল-চিরকাল।

বাস্তবতা
সিস্টার সম্পা গমেজ সিআইসি

করোনা-করোনা-করোনা
সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়েছে করোনা
এটাই কি বাস্তব
হ্যাঁ এটাই সত্য করোনা
তাই সব কিছুই সঠিক
এরই মাঝে কিছু রয় বেঠিক
এটাই কি বাস্তবিক?
এতে রয় অকস্মাৎ সুখ
যদিও এর সাথে থাকে অবিমিশ্র কিছু আনন্দ
এটাই কি বাস্তবিক।
বাস্তবতা প্রকৃত অর্থেই অনশ্বর
সত্যিই অনেকবার তাতো মেনে নিতে হয়
বড় কষ্ট
তবুও সবই বাস্তবিক।
জন্ম মৃত্যু চিরকালীন খেলা
এই সব নিয়ে জীবনের মেলা
সত্যি সবই যে বাস্তবিক।
বাস্তবতা বড়ই কঠিন
যদিও তা মানে না গিয়েও হয় অনেকের
অপরাধ
তারপরও সবই যে বাস্তবিক।
বাস্তবতায় নেই এড়াবার পথ
তা গ্রহণে যে সত্যিই ভয়
তার পরও বলব সবই যে বাস্তবিক।
বাস্তবতাকেই মেনে নেওয়াই জয়
যদিও তাতে হয় বহু সম্পদ ক্ষয়
শেষবারে ও বলা হয়
সবই যে বাস্তবিক।।

অন্ধকার দূর হবে আলো আসবে আবার
স্বপন রোজারিও (মাইকেল)

আবারও বেড়ে গেছে কঠোর লকডাউন,
রাস্তায়ও বেড়ে গেছে প্রাইভেট যানবাহন।
সবই চলছে পথে পাবলিক যান ছাড়া,
করোনা পরিস্থিতিতে মানুষ দিশেহারা।
গুণতে হচ্ছে অনেক টাকা অল্প আয়ের যারা
অক্সিজেনের অভাবে রোগী যাচ্ছে মারা।
কঠোর এই লকডাউন মানতে হবে সবার
অন্ধকার দূর হবে আলো আসবে আবার।

ঘরবন্দির গান
গৌরব জি. পাথাং

মহামারী করোনায় ঘরবন্দি জীবন
বুঝিয়ে দিল কেবা পর কেবা আপন।
আপন হয়ে যায় দুর্দিনে পর
ভুলেও নেয় না তারা কোন খবর
পরই হয়ে উঠে আপনজন।
যন্ত্রের মত ছিল মানব জীবন
সময় ছিল না হাতে খোশগল্পের
কাজের ব্যস্ততায় হারিয়েছিল সুখ
ভালবাসা ছিল শুধু ক্ষণিক-অল্পের
এবার গড়ে তোল প্রেম-বন্ধন।
যেওনাকো বাহিরে নিজ ঘর ছেড়ে
তোমার ঘর তোমার চির আশ্রয়
উজ্জ্বল আলোর রঙিন মার্কেট
হোটেল শপিং মল কোনটাই নয়
পরিবারই তোমারই শান্তিনিকেতন।

বিনম্র রজনী
মিনু গরেট্টী কোড়াইয়া

ছিল যত তারা আকাশের গায়, ম্লান হয়ে গেল সবই
উচ্ছল দিগন্তে ঘনকালো মেঘ, এঁকেছে বিষন্ন ছবি।
নীলভূমিতে দম্ভ করে বেড়ায়,
অশরীরী গগনচারী
স্থির হয়ে চাঁদ রয় এককোণে, বাতাস ভীষণ ভারী।
দানবের চক্ষু রক্তছায়া ফেলে, লাগে মরণের ভয়
শান্ত আকাশতলে ওঠে গর্জন, জাগে চরম বিস্ময়।
অকুল পাথারে লুকায় দিবাকর, দিগন্তে
অমানিশা
মহাপ্রলয়ে ভাঙ্গে মেঘবাড়ি, নভোচারী হারায় দিশা ।
উড়েউড়ে মেঘ পালায় সুদূরে, বৃষ্টিহীন সুবর্ণ ভূমি
নিশ্চুপ বৃক্ষরাজ রোপিত বীজ,
উঠে না গর্ভচুমি।
শূন্য ধরাতল, বাগান বাড়ি, কেবলই ধূসর মরু
ধূলির ঝড় বাড়ায় তাণ্ডব, ফোটে না গন্ধতরু।

বাজাবে কে বাঁশি নাশিবে শঙ্কা,
ছড়াবে দিব্যজ্যোতি
গগনে উঠবে চাঁদ ও তারা, নিশিতে জ্বলবে বাতি।
আকাশ ধরনী রবে অম্লান,
আসবে বিনম্র রজনী
দানবের দম্ভ হবেই চূর্ণ,
কাননে ফুটবে কামিনী।

অর্ঘ্য
উইলিয়াম রনি গমেজ

মৃত্যুর খুব কাছ থেকে জেনেছি
জীবন কী?
বেঁচে থাকার কি দূরন্ত নির্লোভ বাসনা
প্রতিটি মানুষের।
প্রতি মূহুর্তে মৃত্যু;
প্রতি মূহুর্তে বেঁচে থাকার দুর্দান্ত সংগ্রাম।

মৃত্যুর খুব কাছ থেকে বুঝেছি
সত্যিকারের বেঁচে থাকাটা আসলে কি?
প্রিয়জন ছেড়ে অচেনার ওপারে চলে যাওয়ার
কষ্টটুকুই বা কি?
বিশাল, বিস্তীর্ণ প্রকৃতির দিকে চেয়ে
প্রার্থনা করেছি সবুজ নির্মল বায়ুতে
জুড়িয়ে যাক ফুসফুস
পরিপূর্ণ অক্সিজেনে।

বৃষ্টির অবিরাম ধারাকে বলেছি
ধুয়ে মুছে সম্পূর্ণ সূচী শুভ্র করে দাও আমাকে।
চাঁদের স্নিগ্ধ আলোকে বলেছি
দীক্ষা দাও নতুন জীবনের
নতুন আলোতে ভরিয়ে দাও
আমার আধার ভুবন...।

বেঁচে উঠেছি, এক এক অপার আনন্দ
বিধাতা আমার!
শত-সহস্র প্রতিকূলতা হতে আমাকে
উদ্ধার করেছো
শত কোটি ভক্তি প্রণাম আর
পূজার নৈবেদ্য তাই তোমারই পদতলে॥

আলোচিত সংবাদ

লকডাউনের বিধিনিষেধ ৫ মে পর্যন্ত কার্যকর

করোনাভাইরাস সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণে চলমান লকডাউনের বিধিনিষেধ আরো এক সপ্তাহ বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানিয়েছেন জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন। গত ১৪ এপ্রিল থেকে দেশে যে কঠোর বিধিনিষেধ চলছে, তার মেয়াদ ২৮ এপ্রিল পর্যন্ত ছিল। এখন এক সপ্তাহ বেড়ে তা ৫ মে পর্যন্ত কার্যকর হয়েছে। বৈশ্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় এবং জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে কোভিড-১৯ বিস্তার রোধে চলমান বিধিনিষেধ আরো এক সপ্তাহ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর আগে যে বিধিনিষেধগুলো ছিল, সেগুলো এখনও কার্যকর হবে। তবে এ সময় দোকানপাট ও শপিংমল সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত চালু থাকবে।

ঈদগাহে নয়, ঈদুল ফিতরের নামাজ হবে মসজিদে

ঈদগাহ বা খোলা জায়গার পরিবর্তে পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজের জামাত নিকটস্থ মসজিদে আদায়ের অনুরোধ জানিয়েছে সরকার। সোমবার ২৬ এপ্রিল ধর্ম মন্ত্রণালয় ঈদের নামাজ নিয়ে নির্দেশনা জারি করে। নির্দেশনায় বলা হয়, করোনা সংক্রমণ বেড়ে যাওয়ার কারণে আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতরের নামাজের জামাত ঈদগাহ বা খোলা জায়গার পরিবর্তে নিকটস্থ মসজিদে আদায় করতে হবে। যারা মসজিদে নামাজ আদায় করতে আসবেন, তাদের প্রত্যেককে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে। মাস্ক পরিধান করতে হবে। নামাজ আদায় করার সময় শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে। জামাত শেষে কোলাকুলি করা যাবে না। নির্দেশনায় আরও বলা হয়-

ঈদের নামাজের জামাতের সময় মসজিদে কার্পেট বিছানো যাবে না। নামাজের পূর্বে সম্পূর্ণ মসজিদ জীবাণুনাশক দ্বারা পরিষ্কার করতে হবে। মুসল্লিরা প্রত্যেকে নিজ-নিজ দায়িত্বে জায়নামাজ নিয়ে আসতে পারবেন। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধ নিশ্চিতকল্পে মসজিদে ওযুর স্থানে সাবান/হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখতে হবে। মসজিদের প্রবেশদ্বারে হ্যান্ড স্যানিটাইজার/হাত ধোয়ার ব্যবস্থাসহ সাবান-পানি রাখতে হবে। প্রত্যেকে নিজ নিজ বাসা থেকে ওযু করে মসজিদে আসতে হবে এছাড়াও আরো অনেক নির্দেশনা ছিল।

অনলাইনেও নিত্যপণ্য বিক্রি করবে টিসিবি

ট্রাক সেলের পাশাপাশি এখন থেকে অনলাইনেও নিত্যপণ্য বিক্রি করবে সরকারের বিপণন সংস্থা ট্রেডিং কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ (টিসিবি)। ভোজ্য তেল, ছোলা, চিনি এবং মসুর ডাল এ চারটি পণ্য বিক্রয় করা হবে। 'মাহে রমযানে ঘরে বসে স্বস্তির বাজার' কার্যক্রমের আওতায় সোমবার থেকে শুরু হওয়া এ পণ্য বিক্রি চলবে আগামী ৬ মে পর্যন্ত। ই-কমার্স অ্যাসোসিয়েশনের (ই-ক্যাব) ডিজিটাল হাট ডট নেট এর ৮টি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ন্যায্য মূল্যে এ সব পণ্য বিক্রয় করা হবে। বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুনশি অনলাইনে এ কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি বলেন, মধ্যবিত্ত শ্রেণির মানুষ যাতে এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়, সেজন্য সরকার ই-কমার্সের সহযোগিতায় ভোজ্য তেল, ছোলা, চিনি এবং ডাল বিক্রির সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এতে মানুষ ঘরে বসে পণ্য ক্রয়ের সুযোগ পাবে।

প্রতি লিটার ভোজ্য তেল ১০৮ টাকা এবং চিনি, ছোলা, ডাল ৫৮ টাকা কেজি দরে বিক্রয় করা হচ্ছে। একজন ক্রেতা সপ্তাহে ৫ লিটার তেল এবং ৩ কেজি করে চিনি, ছোলা, ডাল ক্রয়ের সুযোগ পাবেন। ডেলিভারি খরচ ঢাকা শহরে সর্বোচ্চ ৩০ টাকা এবং ঢাকার বাইরে ৪০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ে ঢাকা, টাঙ্গাইল ও সিরাজগঞ্জ জেলায় অনলাইনে পণ্য বিক্রির এ কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্টে ১০ কোটি টাকা দিলেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা সংক্রমণের এই দুঃসময়ে দেশব্যাপী সাংবাদিকদের সহযোগিতার জন্য 'সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট'কে ১০ কোটি টাকা দিয়েছেন। ২৭ এপ্রিল মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রীর প্রেস সচিব ইহসানুল করিম স্বাক্ষরিত এ বার্তায় এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এতে বলা হয়েছে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করোনা সংক্রমণের এই দুঃসময়ে দেশব্যাপী সাংবাদিকদের সহযোগিতার জন্য 'সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট'কে ১০ কোটি টাকা দিয়েছেন।

ভারতে আটকা পড়া বাংলাদেশিরা এনওসি নিয়ে দেশে ফিরতে পারবেন

ভারতের করোনা পরিস্থিতির অবনতির কারণে দুই সপ্তাহের জন্য সীমান্ত বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। এমন পরিস্থিতিতে ভারতে ভ্রমণরত বাংলাদেশীদের দেশে ফেরাতে উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। সেক্ষেত্রে অবশ্যই বাংলাদেশের কলকাতা উপহাইকমিশন থেকে এনওসি (অনাপত্তিপত্র) নিতে হবে। বাংলাদেশের কলকাতা উপহাইকমিশন এক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বলেছে, ২৬ এপ্রিল থেকে ৯ মে পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের স্থলসীমান্তে বিদেশিদের সব ধরনের যাতায়াত বন্ধ থাকবে। এ সময় উপহাইকমিশনে ভিসা সেবা ও স্থলসীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশিদের চলাচলও বন্ধ থাকবে।

যেসব বাংলাদেশী এই মুহূর্তে ভারত সফরে রয়েছেন এবং ভিসার মেয়াদোত্তীর্ণতাজনিত কারণে তাদের বাংলাদেশে ফেরত আসা প্রয়োজন তাদেরকে বেনাপোল-পেট্রাপোল স্থলসীমান্ত দিয়ে দেশে ফেরার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। এ ক্ষেত্রে ৭২ ঘণ্টার মেয়াদ থাকা তাদের কোভিড নেগেটিভ সার্টিফিকেট এবং কলকাতার বাংলাদেশ উপহাইকমিশন থেকে এনওসি নিতে হবে বাংলাদেশে প্রবেশের আগে। বাংলাদেশে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাদের প্রয়োজনীয় কোয়ারেন্টিনের ব্যবস্থা করবে। যেকোনো প্রয়োজনে বাংলাদেশ হাইকমিশনের যোগাযোগ করা যাবে +৯১৩৩৪০১২৭৫০০ নম্বরে। এ ছাড়া উপহাইকমিশনের ফেসবুক ও টুইটারেও যোগাযোগ করা যাবে।

ভিডিও কনফারেন্সিং দেশি অ্যাপ 'বৈঠক' চালু

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ এড়াতে গত বছর থেকে অসংখ্য মানুষ বাসায় থেকে অফিস করেছেন। সহকর্মীদের সঙ্গে বিভিন্ন মিটিং ও আলোচনায় অংশ নিয়েছেন ভিডিও কনফারেন্সিং বিভিন্ন অ্যাপের মাধ্যমে। সম্ভাবনাময় ও সময়ের চাহিদার শীর্ষে থাকা ভিডিও কনফারেন্সিং অ্যাপের বাজার ধরতে দেশীয় প্রোগ্রামারদের তৈরি করা ভিডিও কনফারেন্সিং প্ল্যাটফর্ম 'বৈঠক' পরীক্ষামূলকভাবে চালু করেছে তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) মন্ত্রণালয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন রবিবার 'বৈঠক' অ্যাপে অনুষ্ঠিত এক আয়োজনে এ প্ল্যাটফর্মের উদ্বোধন করেন। আইসিটি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক অনুষ্ঠানে জানান, প্রাথমিকভাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বৈঠক অ্যাপ ব্যবহার করবে। এরপর সরকারি অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগ এবং পরে সাধারণ মানুষের জন্য অ্যাপটি উন্মুক্ত করা হবে।

সংকটেও সফল তরুণরা

করোনা মহামারিতে বিশ্ব যখন সংকট আর অনিশ্চয়তায় তখনো কিছু তরুণ তাদের পরিশ্রম ও অসামান্য অবদানে ছড়াচ্ছেন আলো। প্রযুক্তিভিত্তিক উদীয়মান খাতে অবদান এবং মানুষের জীবনমান ও সমাজ পরিবর্তনে ভূমিকা রাখায় এ বছর ফোর্বস ম্যাগাজিনের 'থার্টি আন্ডার থার্টি এশিয়া ২০২১' তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন বাংলাদেশের ৯ তরুণ। ২০১১ খ্রিস্টাব্দে ব্যবসাবিষয়ক ম্যাগাজিন ফোবর্স এই তালিকা করা শুরু করে। ২০১৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২০২০ পর্যন্ত মোট ৯ বাংলাদেশি এই তালিকায় স্থান পান। আর ২০২১ এ এসে এক বছরেই ৯ তরুণ সম্মানজনক এই স্বীকৃতি পেলেন, যা করোনা সংকটেও বাংলাদেশকে একটি সম্ভাবনার কথা জানাচ্ছে।

প্রযুক্তি উদ্যোক্তা বিভাগে স্থান পাওয়া তিন বাংলাদেশি হচ্ছেন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) ভিত্তিক উদ্যোগ 'গেজ টেকনোলজিসের প্রতিষ্ঠাতা শেহজাদ নূর তাওস প্রিয় (২৪), মোতাসিম বীর রহমান (২৬) এবং স্টার্টআপ স্ক্রামস্ট্যাকের প্রতিষ্ঠাতা মীর সাকিব (২৮)। সামাজিক প্রভাব ক্যাটাগরিতে বাংলাদেশের তিনজন সম্মানিত হয়েছেন। তারা হলেন 'অ্যাওয়ারনেস ৩৬০' এর সহপ্রতিষ্ঠাতা শোমি চৌধুরী (২৬) ও রিজভী আরেফিন (২৬) এবং অভিযাত্রিক ফাউন্ডেশনের আহমেদ ইমতিয়াজ জামি (২৭)। সেরার তালিকায় থাকা বাংলাদেশের বাকি তিনজন হলেন হাইড্রোকো প্লাসের প্রতিষ্ঠাতা রিজভানা হৃদিতা (২৮) ও মো. জাহিন রোহান রাজীন (২২) এবং পিকাবোর সহপ্রতিষ্ঠাতা মোরিন তালুকদার (২৭)। ২০১৮ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত ঢাকাভিত্তিক হাইড্রোকো প্লাস নিরাপদ পানি নিয়ে কাজ করে। সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং সেবামূলক সংস্থা পানির গুণগত মান নিয়ে করা তাদের প্রযুক্তি ব্যবহার করে থাকে॥

উৎস : দৈনিক জনকণ্ঠ, ইত্তেফাক ও কালেরকণ্ঠ

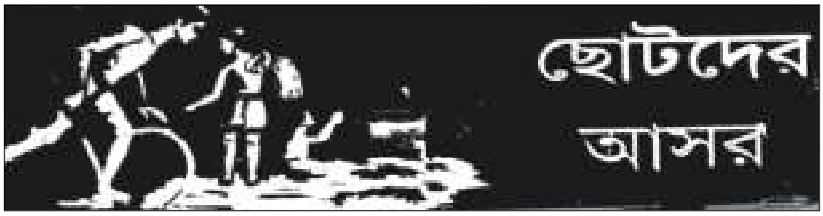

প্রসন্ন চিত্তে দাও এবং গ্রহণ কর

টাকা দেওয়া অনেক আনন্দের এবং ঐ টাকা দিয়ে প্রয়োজনের সময় নানা জিনিস কেনা যায়, যাতে তোমার পরিবার ও বন্ধুবর্গ সেগুলি ব্যবহার করতে পারে। আর দরিদ্র, গৃহহীণ মানুষ এবং রোগীদের জন্য আরো বেশি আনন্দের।

যদি তোমার অন্তর কঠিন এবং নিরস অনুভূত হয়, দান করলে সেই অন্তর রেশমী বস্ত্রের ন্যায় কোমল হয়ে উঠবে। আর যখন তুমি কাউকে কিছু দান কর, তুমি দেখবে যে, সেই মানুষটিকে তুমি আরে বেশি ভালবাসতে পারছ। অন্য লোকদেরও তুমি আরো বেশি ভালবাসবে।

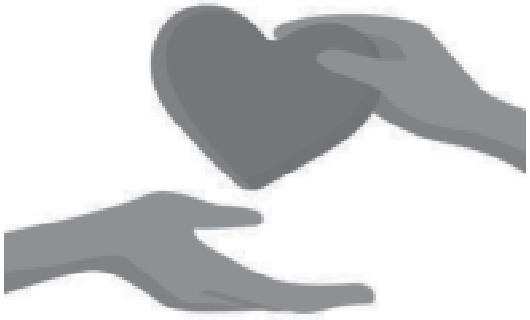

কেউ কখানো তোমাকে উপহার দিলে তা খুশীমনে গ্রহণ কর। ফিরিয়ে দিও না। দানের জন্য গ্রহীতার প্রয়োজন -খুশি গ্রহীতা।

বই : ৬০টি উপায়ে, নিজেকে বিকশিত হতে দাও

মূল লেখক : মার্থা মেরী মনগ্যা সিএসসি

অনুবাদ : রবি খ্রিস্টফার ডি'কস্তা (প্রয়াত)

প্রার্থনা

হে প্রভু, মনিষীরা বলেছেন, "নিশেষে প্রাণ, যে করিবে দান, ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই"। দান করা যেমন আনন্দের, তেমনি গ্রহন করা ও আনন্দের। দানের সাথে-সাথে কঠিন এবং নিরস মন আনন্দে ভরে ওঠে। প্রসন্নচিত্তে আমি যেন দান করি এবং দান করি। - আমেন।

ঐশ কৃপায় মনোনীত জন

অন্তর দাস

দায়ূদ বংশের মানুষ যিনি
ঐশ কৃপায় মনোনীত জন তিনি
পরম পিতার মহা পরিকল্পিত
যোসেফ হয়ে জন্মিলে তুমি।

দায়ূদ বংশের মানুষ যিনি
মুক্তিদাতার খ্রিস্টের পালক পিতা তিনি
মা-মারিয়ার পূণ্যশীল
স্বামী হইয়া জন্মিলে তুমি।

আজি ঐশ কৃপায় কৃপাময় পূণ্য হে তুমি
কঠোর শ্রমের আদর্শ শ্রমিক তুমি
আজি বিশ্ব সভায় পূজিত তুমি
নমঃ হে নমঃ হে মহান তুমি।

তাই স্বর্গীয় আশীষ আনো আজি
বিশ্ব পিতাকে করিয়া রাজি,
যেন দিন-মজুর আর কুলি-মুটে
ন্যায্যতা পায় আজি।

অন্যায্যতা আর অরাজকতা
তাই সমতার আশীষ আনো হে আজি
বিশ্বকে করিতেছে গ্রাস আজি
বিশ্ব পিতাকে করিয়া রাজি।

কেমন তোমার ছবি এঁকেছি!

ম্যানি ফার্দিনান্দ পেরেরা
সেন্ট ভিনসেন্ট ডি'পল প্রাইমারী স্কুল
২য় শ্রেণি

বিশ্ব মণ্ডলীর সংবাদ

ফাদার বুলবুল আগষ্টিন রিবেরু

৪দিনে ইণ্ডিয়া হারালো ১৪জন কাথলিক যাজককে

কোভিড -১৯ সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ ইণ্ডিয়ার স্বাস্থ্যব্যবস্থাকে ভেঙ্গে দিয়েছে এবং সারাদেশ থেকে খবর এসেছে ২০ থেকে ২৩ এপ্রিল এ ৪দিনে মোট ১৪জন কাথলিক যাজক করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছেন।

ইণ্ডিয়ায় কোভিড-১৯ সংকট : করোনাভাইরাসের মহামারির দ্বিতীয় ধাক্কায় নাকাল অবস্থা ইণ্ডিয়ার। প্রতিদিনই রোগি বাড়ছে। বাড়ছে মৃত্যুর হার। শ্মশানে দিন-রাত জ্বলছে চিতা। হাসপাতালে শয্যার সংকট, অক্সিজেন সংকটসহ নানা সমস্যা প্রকট আকার ধারণ করছে। এরমধ্যে উদ্বেগ আরো বাড়িয়ে দিয়েছে পরিবর্তিত হয়ে তৈরি হওয়া করোনাভাইরাসের নতুন ধরণ। ইণ্ডিয়ার সংবাদমাধ্যম জানায়, গত কয়েকদিন ধরেই দেশে রোগি শনাক্তের সংখ্যা তিন লাখের ওপরে। দিনে-দিনে এই সংখ্যা বাড়ছে। গত ৫দিন ধরেই তিন লাখের বেশি রোগি সনাক্ত হচ্ছে। তার আগে ১৫ এপ্রিল থেকে দেশটিতে প্রতিদিন দুই লাখের বেশি করোনা রোগি শনাক্ত হচ্ছিল। আর ছয়দিন ধরে ভারতে দুই হাজারের বেশি মানুষ করোনায় মারা যাচ্ছে। ১৬ মিলিয়ন আক্রান্ত করোনা রোগি নিয়ে ইণ্ডিয়া যুক্তরাষ্ট্রের পরেই রয়েছে।

করোনার এই সংকট শেষকৃত্য অনুষ্ঠানকেও স্পর্শ করেছে। মৃতব্যক্তির পরিবারগুলো দিনকে দিন অপেক্ষা করছে তাদের প্রিয়জনদের শ্রদ্ধা জানিয়ে সমাহিত করতে। ইণ্ডিয়াতে কাথলিক রীতি এবং সিরো মালাবার ও সিরো মালাঙ্কারা রীতিতে বিশ্বাসী কাথলিক মণ্ডলীর ধর্মপ্রদেশীয় ও সন্ন্যাসব্রতী যাজকদের সংখ্যা ৩০,০০০জন। মাত্র ৩দিনে দেশের বিভিন্নস্থানে ১৪জন মারা গেছেন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে এবং ১মাসে হারিয়েছে ২০জন যাজককে।

২৩ এপ্রিল মারা গেছেন নাগপুর আর্চডায়োসিসের ৩৮ বছরের তরতাজা যুব যাজক ফাদার লিজো টমাস। একইদিনে ঝাড়খান্ডের ডুমকা ডায়োসিসের ৫৮ বছরের যাজক ফাদার এস খ্রিস্টদাস মারা যান। কোভিড থেকে সেরে উঠলেও পরবর্তী দুর্বলতায় বাথরুমে পড়ে তিন মারা যান। তিনি আদিবাসী অধিকার নিয়ে স্বোচ্চার ছিলেন। ঐদিনেই জেজুইট সংঘের ফাদার শ্রীনিবাসান, দিয়াগো ডি'সূজা এবং আরুলসামি মারা যান। করোনা আক্রান্ত হয়ে ২২ এপ্রিল মারা যান র‍্যাঙ্গালুরু ডায়োসিসের ফাদার মার্টিন আন্তুনী ও কার্নাটকের ফাদার প্রবীণ ঋদুরাজ। ২১ এপ্রিলে মারা যান লক্ষ্মৌর ফাদার বসন্ত লাকড়া, পাটনার ফাদার জর্জ কারামায়িল এসজে, ফাদার টসাম আক্কারা এসডিবি, ফাদার যোসেফ খেরুজসেরিল ও ফাদার থিওডোর টপ্য। ২০ এপ্রিলে মারা যান রাইপুর আর্চডায়োসিসের ফাদার আন্তুনী কুন্নাদ ও মেরুত ডাইয়োসিসে ফাদার সঞ্জয় ফ্রান্সিস। এছাড়াও মহিলা ধর্মসংঘেও করোনাভাইরাস বেশ আঘাত করেছে।

আর্মেনিয়ার জন্য পোপ মহোদয়ের চিকিৎসা সরঞ্জাম উপহার

পোপের প্রতিনিধি আর্চবিশপ হোসে বেটেনকোর্ট অ্যাম্বুলেন্স আশীর্বাদ করছেন

আর্মেনিয়াতে পোপের প্রতিনিধি পুণ্যপিতার যত্ন ও বিবেচনার বাস্তব চিহ্ন বিতরণ করেন। গত রবিবার (২৫/০৪/২১) পোপের প্রতিনিধি আর্মেনিয়ার উত্তরাঞ্চলে আসোটক শহরে অবস্থিত কাথলিক 'রিডেমটোরিস মাতের' হাসপাতালের জন্য পোপ মহোদয়ের দেওয়া উপহার আশির্বাদ করেন।

কোভিড মোকাবেলার সরঞ্জাম : ভাতিকানের প্রেস অফিসের বিবৃতিক্রমে, পোপের উপহার হিসেবে রয়েছে মোবাইল চিকিৎসা সরঞ্জাম দিয়ে সজ্জিত অত্যাধুনিক একটি অ্যাম্বুলেন্স এবং কোভিড-১৯ রোগিকে সহায়তাদানের জন্য শ্বাস সচল রাখার কৃত্রিম যন্ত্র।

এ উপহার গ্রহণে হাসপাতালের পরিচালক ফাদার মারিও কুকারাল্লোর সাথে আর্চবিশপ বেটেনকোর্ট পূর্ব ইউরোপের উপাসনা রীতি পালনে অংশগ্রহণ করেন। দেশের কাথলিক স্বাস্থ্য দপ্তর হাসপাতালের প্রয়োজনে কোভিড রোগীদের চিকিৎসার জন্য ও কোভিড পরীক্ষার জন্য আরো প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সামগ্রী ক্রয় করে।

আর্মেনিয়া করোনাভাইরাসের সংক্রমনের তৃতীয় ঢেউ থেকে বেরিয়ে আসছে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। ৩০ লক্ষ জনসংখ্যার দেশটিতে গত ২৪ ঘন্টায় ৪১০টি নতুন সংক্রমনের কথা জানা গেছে।

পোপ ফ্রান্সিসের এই উপহার সহজে পৌঁছে দিতে ভাতিকানের বেশ কয়েকটি সংস্থা একসাথে কাজ করেছে। এই দয়ার কাজে পোপের প্রতিনিধির সাথে সমন্বিত মানব উন্নয়ন দপ্তরের সহযোগী মানবিক সংস্থা 'গুড সামারিতান ফাউন্ডেশন' সক্রিয় অংশ নিয়েছে। পোপ মহোদয়ের এই উপহার এসে পৌঁছে আর্মেনিয়ার গণহত্যা দিবস বার্ষিকীর পরের দিন। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময় অটোমান সম্রাট পাশবিকভাবে অসংখ্য আর্মেনীয় খ্রিস্টানদের হত্যা করেছিল।

আসোটক শহরের 'রিডেমটোরিস মাতের' হাসপাতালটি পরিচালনা করেন কামিলিয়ান ফাদারগণ এবং যারা দরিদ্র তাদেরকে কমমূল্যে স্বাস্থ্যসেবা দিয়ে যাচ্ছে। যারা একদমই চিকিৎসাব্যয় বহন করতে অপারগ তাদের বিনামূল্যে চিকিৎসাসেবা দিচ্ছেন কামিলিয়ান ফাদারগণ। বিগত ২৫ বছর যাবৎ তারা এ সেবা দিয়ে যাচ্ছেন।

মহামারী-উত্তর জীবনের কেন্দ্রস্থলে রাখুন খ্রিস্টযাগকে

– ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের বিশপগণ

গত সপ্তাহে অনুষ্ঠিত ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের বিশপদের বসন্তকালীন বিশেষ সভায় এ বিবৃতি দেওয়া হয় যে, মহামারী-উত্তর সময়ে রবিবারের খ্রিস্টযাগকে জীবনের কেন্দ্রস্থলে রাখতে হবে। মহামারী-উত্তর পুনরুদ্ধার এর উপর গভীর অনুধ্যান রেখে বিশপগণ বিশ্বাসীবর্গকে উৎসাহ দিয়ে বলেন, মণ্ডলীতে ও এর সাক্রামেন্তসমূহে ফিরে এসো।

'প্রভুর দিন' শিরোনামে চিঠিতে বিশপগণ পরিবার, ধর্মপল্লী এবং গত বছরের কঠিন সময়ে যারা হাসপাতালে, কেয়ার হোমসে, স্কুলে এবং কারাগারে অক্লান্ত সেবা দিয়েছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানান। বিশপগণ পুরোহিতদের নেতৃত্বের উপরও বিশেষ নজর রেখেছেন এবং যেসকল পুরোহিতেরা দীনতমদের খাদ্য সরবরাহ করতে অপরিসীম প্রচেষ্টা করেছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

বিভিন্ন সময়ে খাদ্য বিতরণের মধ্যদিয়ে প্রকাশ পেয়েছে উদারতা যা মূর্ত করে তুলেছে ঈশ্বরের হৃদয়ের দয়া, ভালবাসা ও করুণা। এই বিশেষ সময়ে দরিদ্রদের মধ্যে খ্রিস্ট সাক্ষাতের আনন্দ অনেককে আকর্ষিত করেছে এবং অনেক দরিদ্র জনগণও খ্রিস্টের আনন্দ দেখতে পেয়েছে ধর্মপল্লীবাসীর নিঃস্বার্থপরতার মধ্যে।

মহামারী-উত্তর চ্যালেঞ্জঃ মহামারীকালে বিভিন্ন পদ্ধতিতে দীনদরিদ্রদের কাছে পৌঁছানোকে বিশপগণ প্রভূত প্রশংসা করার সাথে বিশেষ জোর দেন মহামারী-উত্তর বিশ্বের দিকে। বিশ্বাসীদের সমাবেশ এবং বিশ্বাসের অনুশীলন এখনও বৃহত্তর প্রকাশ ও শক্তি- এবোধ আনয়ন করতেই বিশপগণ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছেন এবং তারা নির্দিষ্ট দল চিহ্নিত করছেন যাতে সেখানে পৌঁছতে পারেন। বিশপগণ উল্লেখ করেন এ দলের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যারা গির্জায় যাবার অভ্যাস একরকম হারিয়ে ফেলেছিলেন কিন্তু মহামারীর সময় প্রথমবারের মতো কেউ ফিরে এসেছেন। তাই তাদেরকে কোভিড কৌতুহলী আখ্যায়িত করা হচ্ছে। অন্য আরেকটি দল আছে যারা কাথলিক ভক্তি-উপাসনা পুনরুদ্ধার করতে চান না এবং যারা কাথলিকদের আধ্যাত্মিকতা ও তাদের জীবনে তা প্রকাশের ক্ষেত্রে ভীষণ বৈসাদৃশ্য দেখেন।

মণ্ডলীর সম্পদঃ উপরোক্ত চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করার জন্য মণ্ডলীর সত্যিকারের প্রধান সম্পদ হলো 'খ্রিস্টযাগ'। খ্রিস্টযাগ, রবিবারের পুণ্য উপাসনা যা মণ্ডলী গড়ে তোলে এবং পবিত্র আত্মার উপহার এই মণ্ডলীই খ্রিস্টযাগ অনুশীলন করে। খ্রিস্টযাগে পুণ্য বলি হলো মণ্ডলীর জীবন। তাই এই উৎসবে আমাদের শারীরিক উপস্থিতি ও সক্রিয় অংশগ্রহণ আবশ্যক। মহামারী-উত্তর সময়ে রবিবারের খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণকে জীবনের কেন্দ্রে স্থান দেবার আহ্বান রাখেন ইংল্যাণ্ড ও ওয়েলসের বিশপগণ॥

- তথ্যসূত্র : *news.va*

জাফলং ধর্মপল্লীতে যুব সেমিনার

মেলকম খংলা ▯ “প্রকৃতির যত্নে যুবদের করণীয়” এই মূলসুরের আলোকে গত ১১ এপ্রিল, রবিবার, ২০২১ খ্রিস্টাব্দে সাধু প্যাট্রিকের ধর্মপল্লী, জাফলং, রাধানগর, ঘোয়াইনঘাট সিলেটে এক যুব সেমিনারের আয়োজন করা হয়। এই সেমিনারে ২জন ফাদার ও জাফলং ধর্মপল্লীর ৪৭ জন যুবক-যুবতী অংশগ্রহণ করেন। সকাল ১০:৩০ মিনিটে খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন ফাদার পিন্টু কস্তা ওএমআই। তিনি তার উপদেশে- “ঐশ করুণা” সম্পর্কে আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, ঐশ করুণা পর্বটি কিভাবে এসেছে। কিভাবে মানুষ তাদের ভক্তি ও ভালবাসা দিয়ে এই পর্বটি উৎযাপন করছে। যিশু কিভাবে আমাদের দয়া দেখিয়েছেন। খ্রিস্টযাগের পর মূলসুর-“প্রকৃতির যত্নে যুবদের করণীয়” সে সম্পর্কে জাফলং ধর্মপল্লীর পালপুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা সুন্দর সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন- প্রকৃতি ঈশ্বরের দান। ঈশ্বর আমাদের জন্য প্রকৃতি দিয়েছেন যেন আমরা যুব হিসেবে যত্ন নেওয়ার মধ্যদিয়ে এই পৃথিবীকে আরও বাসযোগ্য করে গড়ে তুলি। তিনি বলেন- গাছ রোপণ করার মধ্যদিয়ে, গাছের পাতা অযথা না ছিঁড়ে বা গাছকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার মধ্যদিয়ে, প্লাস্টিক এখানে সেখানে না ফেলে, পানি অপচয় রোধ করে, মোট কথা প্রকৃতিতে যা রয়েছে তা সদব্যবহারের মাধ্যমে প্রকৃতিকে রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারি। সেই সাথে তিনি আরও বলেন- এই বছর আমরা পোপের আরও দুটি পত্রের উপর গুরুত্ব দিচ্ছি। “আমরা সবাই ভাই-বোন” -কারণ আমরা সবাই একই উৎস থেকে এসেছি। তাই একে অন্যের সাথে সম্পর্ক গড়তে, কাছে টানতে, সহযোগিতা করতে যেন উদ্যোগী হই। সেই সাথে সাধু যোসেফের বর্ষে যেন সাধু যোসেফকে নিয়ে ধ্যান করি। তাঁর গুণাবলীগুলো আমাদের জীবনে ধারণ করি সেই আঙ্গিকে জীবন-যাপন করি। তার সহভাগিতা ছিল প্রাণবন্ত ও বাস্তবধর্মী যা সবাইকে উৎসাহিত করেছে প্রকৃতির যত্ন নিতে ও সাধু যোসেফের অনুকরণে জীবন গঠন করতে। পালকীয় পরিষদের সেক্রেটারী ওয়েলকাম লম্বা কিভাবে যুবরা খাসিয়া সমাজে আরও বেশি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে সেই বিষয়ে বাইবেলের আলোকে তাদের উপযোগী করে সহভাগিতা করেন। এতে সবাই স্বর্তস্ফূর্তভাবে সাড়া দান করে। যুবক-যুবতীরা তার সহভাগিতা থেকে তাদের সমাজ সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারছে এবং আরও অবদান রাখতে অনুপ্রাণিত হয়েছে। ফাদার পিন্টু কস্তা ওএমআই “মূল্যবোধের” উপর সুন্দর সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন-মূল্যবোধ কি, কিভাবে আমরা মূল্যবোধ অর্জন করতে পারি, মূল্যবোধের মধ্য দিয়ে জীবন গঠন করলে আমাদের জীবন কেমন হবে, কত ধরনের মূল্যবোধ আছে তা তিনি যুবদের উপযোগী করে সহভাগিতা করেন। তার সহভাগিতা ছিল যুবদের জন্যে খুবই উপযোগী। যা তাদের বিবেককে নাড়া দিয়েছে ও তাদের সচেতন করেছে। যোশুয়া খংস্লিং, জাফলং ধর্মপল্লীর রাংবাবালাং বলেন- মণ্ডলীতে কোন কোন ক্ষেত্রে, কিভাবে যুবরা আরও বেশি অংশগ্রহণ করতে পারে। তাদের ভূমিকা কেমন হতে হবে? সেই সম্পর্কে খাসিয়া ভাষায় সুন্দর সহভাগিতা করেন। সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণে এবং যোশুয়া খংস্লিয়ের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মধ্যদিয়ে বিকাল ৩টায় দুপুরের খাবারের মধ্যদিয়ে যুব সেমিনারের সমাপ্ত হয়॥

রমনা সেমিনারীতে নববর্ষ উদ্‌যাপন এবং সহকারী পরিচালককে বরণ

অর্নব জাস্টিন হালদার ▯ গত ১৪ এপ্রিল, রোজ বুধবার ২০২১ খ্রিস্টাব্দ (১লা বৈশাখ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ) রমনা সাধু যোসেফের সেমিনারীতে আড়ম্বর এবং ভাবগাম্ভীর্যের সাথে ঘরোয়া পরিবেশের মধ্যে পালন করা হয় "পহেলা বৈশাখ" এবং সেমিনারীর নতুন সহকারী পরিচালক হিসেবে বরণ করে নেওয়া হয় ফাদার মার্টিন মন্ডলকে। দিনের শুরুতে সকালে বিশেষ প্রার্থনা ও "এসো হে বৈশাখ" নামক একটি দেয়ালিকা প্রকাশ করা হয়। বিকেলে বাংলা নববর্ষ উৎসব এবং সহকারী পরিচালকের বরণ উপলক্ষে এক বিশেষ খ্রিস্টযাগের আয়োজন করা হয়। সকল বিশপ, যাজক এবং সেমিনারীয়ানদেরকে খ্রিস্টযাগের প্রাক্কালে তিলক চন্দনের মাধ্যমে খ্রিস্টযাগের আমন্ত্রণ জানানো হয়। অতঃপর প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ হাতে নিয়ে শোভাযাত্রার মাধ্যমে চ্যাপেলে প্রবেশ করা হয়।

খ্রিস্টযাগে প্রধান পৌরহিত্য করেন আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই। এছাড়াও তাকে সহযোগিতা করেন আরো ৮জন যাজক। উপদেশ বাণীতে আর্চবিশপ মহোদয় বলেন; আমরা যেন আজকের কাজ আজকেই করি, আগামীকালের জন্য কোনো কিছুই রেখে না দিই। নতুন বছরে এই হোক আমাদের সংকল্প।"

পরে সান্ধ্যভোজ শেষে সেমিনারীর সাংস্কৃতিক কমিটির আয়োজনে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার ব্যবস্থা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে নতুন সহকারী পরিচালককে বরণ করে নেওয়া হয় এবং তার উদ্দেশ্যে অভিনন্দন পত্র পাঠ করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানের সবকিছুই ছিল সহকারী পরিচালক এবং বাংলা নববর্ষকে কেন্দ্র করে। সর্বশেষে আধ্যাত্মিক পরিচালকের সমাপনী বক্তব্য এবং শেষ আশীর্বাদ প্রদানের মধ্যদিয়ে উক্ত দিনের অনুষ্ঠান সমাপ্ত করা হয়॥

অন্তিম যাত্রায় সিস্টার মেরী আনন্দ এসএমআরএ

জন্ম : প্রয়াত শ্রদ্ধেয়া সিস্টার মেরী আনন্দ এসএমআরএ রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লীর রাঙ্গামাটিয়া গ্রামে ১৮ জানুয়ারি ১৯৪১ খ্রিস্টবর্ষে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা মৃত মনাই আন্তনী কস্তা ও মাতা মৃত ম্যাগডেলিনা কস্তা। দুই ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রথম সন্তান।

মৃত্যু : তিনি ১৫ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টবর্ষ, বৃহস্পতিবার, তুমিলিয়া সেন্ট মেরীস কনভেন্টে বার্ধক্যজনিত কারণে সকাল ৯:১০ মিনিটে পিতার ডাকে সাড়া দিয়ে পরপারে চলে যান।

১ম ব্রতগ্রহণ : ৬ জানুয়ারি ১৯৬২ খ্রিস্টবর্ষ।
আজীবন ব্রতগ্রহণ : ৬ জানুয়ারি ১৯৬৮ খ্রিস্টবর্ষ।

প্রৈরিতিক জীবন

শ্রদ্ধেয়া সিস্টার আনন্দ এসএমআরএ একজন নিবেদিতপ্রাণ সন্ন্যাসব্রতিনী ছিলেন। তিনি ১৯৬৪ খ্রিস্টবর্ষ হতে ২০১৪ খ্রিস্টবর্ষ পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে প্রেরিতগণের রাণী মারীয়ার সঙ্গিণী সংঘের বিভিন্ন কনভেন্টে অবস্থান করে প্রাইভেট ও সরকারী প্রাইমারি স্কুলগুলোতে একজন আদর্শ শিক্ষিকা ও প্রধান শিক্ষিকা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। বিশেষভাবে তিনি নাগরী, মঠবাড়ী, মরিয়মনগর, তেজগাঁও, বটমলী হোম, তুমিলিয়া, চড়াখোলা ও শুলপুর প্রাইমারি স্কুলে এমনকি কোন কোন স্থানে একাধিকবারও শিক্ষকতা ও প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করেন।

এছাড়াও তিনি ঢাকা কমলাপুর বৌদ্ধ স্কুলে এবং সিলেটে লক্ষীপুরে নিষ্ঠার সাথে শিক্ষকতাসহ অন্যান্য প্রৈরিতিক কাজ সম্পন্ন করেন। এমনিভাবে তিনি ৫০টি বছর প্রভুর দ্রাক্ষাক্ষেত্রে নিষ্ঠার সাথে সেবাদান করে গেছেন।

২০১৫ খ্রিস্টবর্ষ হতে ২০২০ খ্রিস্টবর্ষের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে মেরীহাউজে অবস্থান করেন। এসময়ও তিনি আন্তরিকতার সাথে আশ্রম সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

২০২০ খ্রিস্টবর্ষের অক্টোবর মাসে অসুস্থতা শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে সিস্টারকে তুমিলিয়া শান্তিভবনে নিয়ে আসা হয় এবং ১৫ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টবর্ষ, বৃহস্পতিবার সকাল ৯:১০ মিনিটে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তার এ ত্যাগময় সেবার জীবনের জন্য আমরা পরম পিতার ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি।

প্রয়াত শ্রদ্ধেয়া সিস্টার আনন্দ ব্যক্তিজীবনে ছিলেন হাসিখুশি প্রাণোচ্ছল, নিবেদিতপ্রাণ একজন সন্ন্যাসব্রতিনী। পরমপিতা তাকে বিভিন্ন গুণে গুণান্বিত করে সৃষ্টি করেছিলেন। তিনি ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষিকা, নাট্যকার, সুগায়িকা ও সদালাপী। তিনি শিশু, কিশোর, যুবক-যুবতীদের মনের কাছাকাছি অতিসহজে অবস্থান করতে পারতেন এবং একজন আদর্শ গঠনদাতা ও শিক্ষাদাতা হিসেবে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে নিজেকে নিস্বার্থভাবে ব্যয়িত করেছেন। সাংস্কৃতিক অঙ্গনে তার ভূমিকা ছিল অপরিসীম। তিনি নাচ, গান ও ধর্মীয় নাটকের মধ্য দিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিলেন এবং এর মধ্যদিয়ে প্রভু যিশুর স্বর্গরাজ্য বিস্তারের কাজকে বিশেষভাবে ত্বরান্বিত করেছেন। সিস্টারের এ সকল দানের জন্য আমরা প্রভুর ধন্যবাদ ও প্রশংসা করি।

আমাদের এসএমআরএ সংঘে আমরা এমনি একজন সেবিকাকে পেয়েছিলাম বলে সত্যিই পরম পিতার নিকট আজ কৃতজ্ঞ। প্রার্থনা করি পিতা যেন সিস্টারকে অনন্তধামে চিরশান্তি দান করেন এবং তার মধ্যদিয়ে আমাদের সংঘকেও আশীর্বাদিত করেন।

- এসএমআরএ সিস্টারগণ

বিজ্ঞ/১২৫/২১

চির শান্তি দাও প্রভু তাঁকে

প্রয়াত রুবেন গমেজ

জন্ম : ২১ এপ্রিল ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ১৯ এপ্রিল ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

আমাদের প্রিয় বাবা **মি. রুবেন** গমেজ ইন্দিরা রোডস্থ নিজ বাসায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে পরবর্তীতে দশদিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থেকে ৮৭ বছর বয়সে মহাখালীস্থ ইমপালস্ হসপিটালে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি পুরান তুইতাল গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেছেন স্ত্রী রেনু গমেজ ও তিন ছেলে, এক মেয়ে, মেয়ে জামাই, দুই পুত্রবধু, তিন নাতিসহ, ভাই-বোন ও অসংখ্য আত্মীয়স্বজন ও গুণগ্রাহীদের।

মি. রুবেন গমেজ তাঁর সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনে প্রথম ত্রিশ বছর বর্তমান বি.আই. ডব্লিউ. টি. সি. - এ অফিসার হিসেবে এবং পরবর্তীতে ১৯৮১ হতে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত কারিতাস বাংলাদেশ এর খুলনার আঞ্চলিক পরিচালক ও কেন্দ্রিয় কল্যাণ পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। পরবর্তীতে তিনি বিভিন্ন অফিসে খন্ডকালীন কাজ করেন। তিনি ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দে তৎকালীন সেন্ট গ্রেগরীজ কলেজ (পরবর্তীতে নটরডেম কলেজ) থেকে আইএ পাশ করেন। সংসারের প্রয়োজনে তিনি পড়াশুনার পাশাপাশি অফিসে কাজ করেন এবং ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে জগন্নাথ কলেজ হতে বিএ পাশ করেন।

তিনি দীর্ঘদিন সমাজ ও মন্ডলীর বিভিন্ন সেবা কাজে জড়িত ছিলেন। তিনি ছিলেন ঢাকা ক্রেডিটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের একজন। ভিনসেন্ট ডি পল সমিতি, মন্ডলীর বিভিন্ন কমিশন, বিভিন্ন সমিতি, তুইতাল ধর্মপল্লীর বিভিন্ন কার্যক্রম, রাজাবাজার নতুন চ্যাপেল নির্মাণ কমিটি, সাধু পলের প্রচার সংঘ, ব্যাপ্টিষ্ট ও এ্যাংলিকান মন্ডলীর উন্নয়ন সংস্থাসহ বহু সংঘ সমিতির সাথে মৃত্যু পূর্ব পর্যন্ত যুক্ত ছিলেন।

গত ১৯ এপ্রিল তেজগাঁও ধর্মপল্লীতে তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খ্রিস্টযাগে পরম শ্রদ্ধেয় আর্চবিশপ বিজয় এন. ডি'ক্রুজ ওএমআই, বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজসহ ১২ জন যাজক পৌরহিত্য করেন। লক-ডাউনের জন্য অনেকে উপস্থিত হতে না পারলেও কারিতাস বাংলাদেশের কেন্দ্রিয় অফিসের পরিচালকগণ, ঢাকা ক্রেডিটের প্রেসিডেন্ট সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, ব্রতধারী-ব্রতধারিণীগণ, আত্মীয়-স্বজন ও শুভাকাঙ্খীগণ উপস্থিত হয়ে তাঁকে সমাহিত করেন। মহামান্য কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও খ্রিস্টযাগের পূর্বে প্রয়াত রুবেন গমেজ এর জন্য প্রার্থনা করেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খ্রিস্টযাগে আর্চবিশপ মহোদয় মি. রুবেন গমেজকে একজন ধার্মিক, নিষ্ঠাবান মানুষ ও সমাজ সংগঠক হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি একজন আদর্শ পিতা ও স্বামী হিসেবে এবং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের জন্য তার সেবা ও ভালবাসা দান করে গেছেন বলে উল্লেখ করেন। আর্চবিশপ মহোদয় শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

আমাদের বাবা রুবেন গমেজ ছিলেন একজন অমায়িক, পরোপকারী, কর্মঠ ও স্নেহপ্রবণ মানুষ। তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী, ধর্মভীরু ও মন্ডলী ও সমাজের একজন নীরব সেবাকর্মী ছিলেন। প্রতিদিন জপমালা প্রার্থনা, নিয়মিত রবিবাসরীয় খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতেন। প্রার্থনা করি আমরা যেন তাঁর আদর্শ অনুসরণ করতে পারি।

তাঁর অসুস্থতার সময় ও মৃত্যুর পর যারা প্রার্থনা করেছেন ও পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। পরম করুণাময় তাঁকে অনন্ত শান্তি দান করুন।

শোকাহত পরিবারের পক্ষে-

সহধর্মিনী : খ্রীষ্টিনা রেনু গমেজ
বড় ছেলে : ফাদার ডেভিড গমেজ
পুত্র ও পুত্রবধূগণ : জুলিয়ান - রোজমেরী, জর্জ - তপতী
কন্যা ও জামাতা : সিন্থিয়া-আন্তনী
আদরের নাতিগণ : জয়, এ্যালেক্স ও এ্যালেন।

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ১৫
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 15

বর্ষ ৮১ ❖ সংখ্যা - ১৫
❖ 2 - 8 May, 2021, ১৯ - ২৫ বৈশাখ, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
Regd. No. DA-33

BOOK POST

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

অজিত কুমার চাক্‌মা
জন্ম : ২ ফেব্রুয়ারি, ১৯৪৯ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ৫ মে, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

একটি বছর পার হয়ে গেলো তুমি আমাদের ছেড়ে প্রভুর চরণে স্থান করে নিয়েছো। গত দুই বছরে Kidney Diolysis নিতে নিতে খুবই দুর্বল হয়ে পড়েছিলে; ৫ মে ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সকালে একেবারেই চলে গেলে। বিকালে জানতে পারি তোমারও নাকি করোনা হয়েছিল।

পিতা ঈশ্বর তোমাকে অনন্ত শান্তি দান করুন। স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো।

তোমার আদরের মামনী : ভিক্টোরিয়া চাঁদনী চাক্‌মা
মেয়ে জামাই : মোশি সায়েন হালদার
নাতি : ইম্মানুয়েল মোজে হালদার (রৌদ্র)
স্ত্রী : করবী হালদার (চাক্‌মা)
ও
সকল আত্মীয় পরিজন

ঠিকানা : ক-১১৭/৯, দক্ষিণ মহাখালী
খ্রিস্টান পাড়া, ঢাকা-১২১৩

প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী

প্রয়াত ঊষারাণী রোজারিও
জন্ম : ৪ নভেম্বর, ১৯৪২ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৬ এপ্রিল, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
প্রয়াত : স্বামী রেজিন্যাল্ড ডি'রোজারিও
ডাগীর বাড়ী, রাঙ্গামাটিয়া ধর্মপল্লী
কালীগঞ্জ, গাজীপুর।

একটি বৎসর পার হয়ে গেল 'মা' তুমি আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছো। আমাদের দশ ভাইবোনদের সর্বদা তোমার আঁচলে আগলে রেখেছিলে বুঝতে দাওনি প্রকৃত ভালবাসার অভাব। তোমাকে ঘিরে আমরা সব ভাই-বোন এক হতাম, কত আনন্দ করতাম তাই আজ, তোমার এই শূন্যতা আমাদের হৃদয়ে বড় বাজে। বিশেষভাবে আমরা যারা তোমার খুব কাছাকাছি কিংবা সঙ্গে ছিলাম-ক্লান্ত হয়ে বাইরে কিংবা অফিস থেকে এসে যখন তোমার শান্ত হাসিমুখ খানা দেখতাম তখন বড় শান্তি পেতাম। তাই বুঝতে পারিনি আগে, তোমার নিরব উপস্থিতি এবং তোমার মধুর কণ্ঠস্বর সর্বদা আমাদের এক পবিত্র অদৃশ্য ভালবাসায় আবৃত করে রেখেছিলো। এখন আর কেউ নেই আমাদের মনের কথাগুলি শুনার এবং বিশ্বাস ভরা সান্ত্বনার বাণী শুনাবার। বড় বেশি আস্থা ছিল তোমার ঈশ্বরের উপর এবং সর্বদা আমাদের জন্য প্রার্থনা করতে, তাই তো আমরা ছিলাম নিরাপদ আশ্রয়ে। এখন বড় ভয় হয় 'মা' ভীষণ অসহায় হয়ে গেলাম আমরা ; হৃদয় গহীনে তোমার শূন্যতা গুমড়ে-গুমড়ে কাঁদছে চোখে আমাদের কারো জল নেই। কিন্তু এক চাপা ব্যাথায় আমাদের হৃদয় সর্বদা কাঁদছে এবং সর্বদা যন্ত্রণা দিচ্ছে। তাই তো আমরা মানসিকভাবে খুবই দুর্বল হয়ে গেছি 'মা'। বর্তমান এই ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আমরা আরো ভীত! তুমি এবং বাবা স্বর্গ থেকে আমাদের আশীর্বাদ করো এবং যত্ন নাও, সান্ত্বনা দাও যে বর্তমান এই পরিস্থিতিতে ঈশ্বরকে গভীরভাবে আঁকড়ে ধরে, সৎভাবে জীবনপথে এগিয়ে যেতে পারি তোমার কাছে আমরা এই প্রার্থনা করি।

শোকসন্তপ্ত পরিবার

মেয়ে ও মেয়ে জামাই : চিত্রা-প্রেমন্ত, জয়ন্তি-নবীন, সিস্টার শিল্পী সিএসসি
নিভতি, সিস্টার পূর্ণা এসএমআরএ, ঋতু-সাগর
ছেলে ও ছেলে বৌ : মিন্টু-মালা, আশীষ-কবিতা, স্বপন, রিমেল রোজারিও
নাতি ও নাতি বৌ : রুপম-এ্যানি, রোসি-অতশি, আর্যার, কাজল, মানি
নাতনী ও নাতনী জামাই : রেশমী-বিকাশ, এলিস
পুতিন : ইভান, ঢেইজ, রঞ্জন ও ঈশান।

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro**, Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Bangladesh, Phone : (880-2) 47113885, Printed at Jerry Printing, 61/1, Subhash Bose Avenue, Luxmibazar, Dhaka-1100, Phone : 47113885, E-Mail : **wklypratibeshi@gmail.com**, Web: weekly.pratibeshi.org